তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

আলাউদ্দিন আল আজাদ

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

আলাউদ্দিন আল আজাদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

শিল্পীবন্ধু আমিনুল ইসলামকে, মালিবাগের দিনগুলোর স্মরণে

সবিনয় নিবেদন

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র আমার প্রথম উপন্যাস। যে কোনো লেখক শিল্পীর প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে তার যে অনুরাগ ও দুর্বলতা, এই লেখাটিও আমার হৃদয়ে তেমনি মিঠেকড়া, 'কাটাগুল্মময়, কখনো বা স্বপ্নের মায়াবৃক্ষ। লিখন সময়েই ছিল জীবনের গভীরে নিমজ্জন ও বিচ্ছিন্নতা, যা তখন আমার জানা ছিলোনা— আজ বহুদিন পরে কাব্যতত্ত্বের এই উপাদান আবিষ্কার করে আমি বিস্মিত হই। জাহেদ চরিত্রে লেখকের আত্মবিলুপ্তি ঘটেছে, জিনিশটা তখন বুঝতে পারিনি।

পদক্ষেপ নামের একটি অনিয়মিত কাগজের ঈদসংখ্যায় গল্পটি প্রথম ছাপা হয়েছিল (১৯৬০)। একে বই আকারে প্রথম প্রকাশ করেন নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রচ্ছদে ছিল মোহাম্মদ ইদ্রিস আঁকা মাতৃমূর্তি। সে সময়কার নওরোজের মোহাম্মদ নাসির আলি সাহেবকে ভুলতে পারিনা। তাঁর স্মিতহাস্য ও সহানুভূতি অতুলনীয় ছিল। মুক্তধারা সাতবার ছেপেছে। সেজন্য অগ্রজপ্রতিম চিত্তরঞ্জন সাহার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তৈলচিত্রের দশম মুদ্রণ নতুন মুদ্রণ প্রযুক্তিতে প্রকাশ করছেন আহমদ পাবলিশিং হাউস। পরম সুহৃদ মেছবাহউদ্দীন আহমদকে সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

মঙ্গলবার, মাঘ ১৯, ১৪০০
ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৯৪
রত্নদীপ, উত্তরাঢাকা।

লেখকের অন্যান্য বই

কাব্যগ্রন্থ ঃ সাঁজঘর

উপন্যাস ঃ স্বাগতম ভালোবাসা

অপর যোদ্ধারা পুরানা পল্টন

এক

রংবেরং গাউন শাড়ি ওড়নার খস্‌খস্‌, পালিশ করা কালো চক্‌চকে জুতোর মচ্‌মচ, বিচিত্র কণ্ঠনিঃসৃত সংলাপের ঐকতান, এখন আর নেই। রাত দশটা, একজিবিশন হলের ভারী দরোজা প্রথম দিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল।

প্রথম দিনেই পুরস্কার ঘোষণা। বিদেশী কূটনীতিবিদ, উচ্চ সরকারী কর্মচারী, গণ্যমান্য নাগরিক, সাংবাদিক ও দর্শক নারী-পুরুষে ঘরটা জমজমাট। জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, হয়তো তাই এতো ভিড়। উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার জন্য স্যুটপরা গাট্টাগোট্টা মন্ত্রী মহোদয় উঠে দাঁড়ালেন। ললিতকলার ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তৈরি করা কথাগুলো শেষ করবার পর বললেন, রিয়্যালী ইট ইজ মাচ এনকারেজিং দ্যাট নিউ ট্যালেন্টস্‌ আর কামিং ফরওয়ার্ড টু এনরিচ্‌ দিস্‌ ফিল্ড অব্‌ ন্যাশন্যাল গ্লোরী। এ্যাণ্ড আই এ্যাম্‌ রিয়্যালী হ্যাপী টু এনাউন্স দ্যাট দি পোর্ট্রেট, হুইচ স্টুড্‌ ফার্স্ট ইন দিস একজিবিশন, সো ফার আই রিমেম্বার, অয়েল পোর্ট্রেট নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি, ইজ নট অনলি এ গুড পীস অব আর্ট, বাট অলসো ভেরী নিয়ার টু এ মাস্টারপীস!

তখন সকলের মধ্যে গুঞ্জন পড়ে গিয়েছিল। বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র ছবিটা দেখবার জন্য সে কি ঠেলাঠেলি। বেশির ভাগ দর্শক ভিড় জমালো গিয়ে সেখানেই। এই সঙ্গে শিল্পীর খোঁজ নিতেও ছাড়ল না।

ভেরী গ্ল্যাড টু মীট্‌ ইউ। প্রসাধন-করা মুখ, একজন প্রৌঢ়া মহিলা বললেন, স্যার উইল ইউ হ্যাভ এ কাপ অব টী উইথ মী এ্যাট মাই হোম?

মহিলা একজন বিশেষ পরিচিত শিল্প সমঝদার। সময় পাব কিনা জানিনে, তবু বলে ফেললাম, ও সার্টেন্‌লী, ইট উইল বি এ প্লেজার টু মী!

কলেজের দু'তিনটে ছোকরা ও একটি মেয়ে আমার অটোগ্রাফও নিয়ে গেল। তাজ্জব এই এক মুহূর্তেই বিখ্যাত হয়ে গেলাম নাকি?

দেহমনে ক্লান্তি নেমে এসেছিল। চারটে বড়ি খেয়েও মাথা ধরাটা ছাড়ল না। কিন্তু তবু এখন গিয়ে যে শুয়ে পড়ব, সে ভরসা নেই। তিন রত্নের জোট। রাস্তায় বেরিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘোরাফেরা করবে, সঙ্গে না গেলে বলবে প্রাইজ পেয়ে পায়াভারী হয়েছে, মাটিতে পা পড়তে চায় না। আমি ভীরু নই, তবু এই অপবাদ স্বীকার করে নেব না বলেই হোটেলে ফিরে গেলাম না।

আমার তিন বন্ধু, তিনজনেই গুণী ছেলে, আর্ট স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিল, বিদেশ ঘুরে এসেছে। চিত্রকলার তীর্থভূমি ফ্রান্স, ইতালী, ইংল্যান্ডের গ্যালারী রেস্তোঁরা গলিঘুজি ওদের নখদর্পণে, কোনো প্রসঙ্গে কথা উঠলেই চিৎকার করে ওঠে একেকবার। লন্ডনের কোন্‌ বাইলেনের কোন্‌ ঘুপচি আধো অন্ধকার কফিঘরে রাগী ছোকরাদের আড্ডা নোট বইয়ে তার ঠিকানা লেখা আছে; বুনিয়াদের ওপর নিজেদের ঘর তোলার জন্যই বুনিয়াদের বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ।

এরাও বিদ্রোহী। আর সে শুধু ভেতরে নয় বাইরেও। পোশাক-আশাক কেমন খাপছাড়া, তেরপালের মতো মোটা নীলচে কাপড়ের আটসাঁটো প্যান্ট আর গায়ে হাল্‌কা সবুজ রঙের জ্যাকেট। জুতোগুলো অর্ডার দিয়ে তৈরি করা অদ্ভুত সাইজ, বাজারে যার প্রচলন নেই। মাথার চুল কাটে না কখনো, চুলে তেল দেয় না তাই কুঁকড়ে কুঁকড়ে ফুলে ফুলে থাকে। ছ'মাস দাড়ি রাখে, আর ছ'মাস গোঁফ। দাড়ি যতদিন থাকে গোঁফ প্রায় প্রতিদিন পালিশ করে কামায় এবং গোঁফের কালে দাড়িরও সেই অবস্থা। ওদের অলিখিত রীতিতে গালে চড় দেওয়া মানে ভালোবাসা, হাউমাউ করে কেঁদে ওঠা মানে হাসা। কোনো কারণে কেউ হাসলে অন্যজনে মুখ চেপে ধরে তার- এ নাকি কান্না এবং কান্না জিনিশটা সহ্যের অতীত। নারীর সঙ্গে পুরুষের কি ধরনের সম্পর্ক হবে, সে সম্পর্কে তাদের মতামত অদ্ভুত বটে কিন্তু নিঃসন্দেহে অভিনব।

আসলে সমাজ ও সভ্যতা ছেঁড়াকোটের মতোই জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, কাজেই এর মূল্যবোধের কোন অর্থ নেই। শিল্পে ও জীবনাচরণে কিম্ভূতকিমাকার হওয়াটাই যুগের দাবি এবং এখানেই বিদ্রোহ। বিকৃতি ব্যাপক বলেই আকৃতির কোন প্রয়োজন নেই। বিকৃতিকে অধিকতর বিকৃতি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, বিষের ওষুধ বিষ।

তাছাড়া, জীবনটা নাতিদীর্ঘ উত্তেজনা মাত্র, সেনসেসন। প্রতিমুহূর্তে সেই সেনসেসন লাভ করাই প্রধান কাজ। সে যে ভাবেই হোক। একজন মানবীর মাথার চুলে আদর করার চেয়ে কুকুরীর গাল চেটে যদি তা পাওয়া যায় তাহলে সেটাই কাম্য।

মুজিব রোমের একটি প্রাচীন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। যেখানে সে থাকত সেই বুড়ি বাড়িওয়ালির মধ্যবয়সী মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল প্রায় রোমিওর মতো। ছুকরিদের সে পছন্দ করে না মোটেই, বলে মাকাল, বাইরে আকৃতি ও বর্ণ আছে বটে, কিন্তু কোন স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, গভীরতা নেই। ঐ মেয়েটিকে সে পাবে না জানত, তবুও ওর সবজি ব্যবসায়ী স্বামীর সঙ্গে যে খাতির হয়েছিল সেটাই পরম লাভ।

আমেদও প্রেমে ব্যর্থ হয়েই ধাক্কাটা সামলাবার জন্য জোগাড় যন্ত্র করে লন্ডন যায়। সেখানে ওর ভাই থাকতেন। কাজেই বিশেষ অসুবিধে হয়নি। বেশি বেশি টীপ দিয়ে সেও রেস্টুরেন্টের এক নাবালিকার সাথে ভাব জমিয়েছিল। কিন্তু একদিন ওকে দিয়ে গোপনে একটা অস্বাভাবিক কাজের চেষ্টা করে। মলি ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করে দিলে তাকে অনেক কড়াকথা শুনতে হয়েছিল।

এ বিষয়ে রায়হান সবচে দুঃসাহসী এবং উদার। নিজের নির্বাচিত মেয়েকে অন্য লোকের সাথে কেলিরতা অবস্থায় দেখতেই সে ভালোবাসে আর এভাবে সে যে উত্তেজনা লাভ করে তা অতুলনীয়, অকথ্য। কিন্তু এজন্য তিনটি মেয়ের সঙ্গেই হয়েছে ওর ছাড়াছাড়ি।

এরা আমার বন্ধু সেজন্য গৌরব বোধ না করে পারি না। ইউরোপে প্রত্যেকের একক প্রদর্শনী বহু সমঝদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, খবরের কাগজে সচিত্র সমালোচনার কাটিং দেখেছি। প্রথম পুরস্কার আমি না পেয়ে ওদের যে কেউ পেলে

আরও খুশি হতাম। সেজন্য ভেতরে ভেতরে একটু লজ্জিত আছি। বন্দর রোডে পড়ে সোজা হাঁটতে শুরু করলে শুধোলাম, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

তা জানার দরকার কি বাবা! পদাঙ্ক অনুসরণ কর চুপচাপ! এখানে তো আর বৌ নেই? হেঃ হেঃ হেঃ!

ফার্স্ট প্রাইজ পেলি, ফুর্তি লাগছে না? শয়তানের পাছ ধরে নরকে গেলেও এখন আনন্দিত হওয়া উচিত!

আরে ভালো কথা, কালকে কিছু ঢালিস্ তো? ছবি থেকে পাঁচশ' টাকা পেলি, তিন বোতল খাঁটি মাল চাই, তার একরত্তিও কম নয়!

সাট্যেন্‌লী; সাট্যেন্‌লী! অদ্ভুত মুখ বানিয়ে রায়হান টেনে টেনে বলল, এবং সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা পরটা আর মুরগীর মাংস!

জিভটা বার করে এমনভাবে ঠোঁট চাটল, আমরা হেসে উঠলাম। আমি বললাম, টাকাটা আগে পেতে দাও। ভদ্রলোক কিনেছেন, কবে নেন তার ঠিক কি।

যবেই নেন, নেবেন তো? ব্যস, সেদিন হবে। কিন্তু আসল কথা কি জানিস? টেনে ফেললে সবশেষ এখন তা ভাবতে যে পাচ্ছি, এটাই আসল! বলে রায়হান বাতাসে সশব্দে একটা চুমুক দিল।

ইয়েস্! স্পীকিং জাস্ট লাইক এ্যান এ্যাংরি ইয়ংম্যান! আমেদ রায়হানকে বলল, কনুইটা বাড়িয়ে দে ওস্তাদ, চুমু খাই।

থামতে হল। গম্ভীর ভঙ্গিতে ওদের কাণ্ডটা শেষ হবার পর আবার চলতে শুরু করি!

রাত সাড়ে এগারোটায় ছ'মাইল পথ হেঁটে গিয়ে দু'কাপ কফি চারজনে ভাগাভাগি করে খাওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চ আছে বৈকি! সে রোমাঞ্চ আমিও পেলাম। তবে শরীরটা ঝিমিয়ে এল, এই যা। রাত একটার সময় পা টেনে টেনে যখন হোটেলে এলাম, তখন মগজে কিছু অবশিষ্ট নেই। উদরে তো নয়ই। দারোয়ানের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল, ডাকতেই উঠে এল। গেট পেরিয়ে কামরার তালা খুলে ভেতরে গেলাম। দেখি খাবার ঢাকা দিয়ে গেছে বয়। কি আর খাব। নানা রকম খাদ্যদ্রব্যে মনটা ঠাসা, আর এই তো যথেষ্ট। তবু পেটের জ্বালায় খানিকক্ষণ বসে দু'টো রুটি চিবোই।

পীড়াপীড়ি করতে থাকায় আমাকে গালাগালসহ গেটের কাছে পৌঁছে দিয়ে ওরা আবার বেরিয়ে পড়েছিল। রাত তিনটে না বাজলে নেশা জমে না।

পরদিন ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। করাচীর কর্মব্যস্ত উজ্জ্বল সকাল। গোসল করে নাস্তা খাওয়ার পর আস্তেধীরে বেরুলাম। গিয়ে দেখি একজিবিশন হলের দরোজা খোলা হয়েছে যথারীতি। এ বেলায় লোকের ভীড় নেই, তাছাড়া শিল্পীদের উপস্থিত থাকারও কোন কথা ছিল না। নেহাৎ ভাড়া দিয়ে এনেছে এবং প্রথম দিন বলে গতকাল উপস্থিত ছিলাম। আজকে আসার প্রধান কারণ, ছবির টাকাটা পাওয়া যায় কি না।

ভাগ্যি ভালো পেয়েও গেলাম বারোটার সময়। আরও ছবি বিক্রি হয় তো হবে, নয় এই যথেষ্ট। কেনাকাটার যে ফিরিস্তি এনেছিলাম তার জন্য চারশ' টাকার প্রয়োজন ছিল। এখন হাতে আছে পাঁচশ' মন্দ কি?

মায়ের দূর সম্পর্কের বোন জোবেদা খালা এই শহরেই বাস করেন। নামকরা একজন মাদ্রাজী ব্যবসায়ী তাঁর স্বামী। আমি আসছি চিঠিতে জানিয়েছিলাম। প্রথম দিনই বিমানবন্দরে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। গাড়িতে এলাম বটে কিন্তু তাঁর বাড়িতে উঠি নি। কারণ থাকবার ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছিল। এসেছি দেখবার জন্য, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শটাও লোভনীয়।

রাস্তার ধারে প্রাসাদোপম বিরাট বাড়ি। আজ গিয়ে দেখা দিলে জোবেদা খালা ভীষণ খুশি হলেন। আদর করে বললেন, এসেছিস ভালোই হল। আজ আমরা বেড়াতে যাচ্ছি, ম্যানোরায়। তুইও চল!

বললাম, নিশ্চয়ই যাব, অবশ্যি যদি আপনাদের কোন অসুবিধে না হয়।

অসুবিধে? কি যে বলিস! যত লোক হয় ততই ভালো। তাছাড়া এই প্রথম এলি করাচী, আমাদের কিছু করার আছে তো? বৌমাকে নিয়ে এলেই পারতিস? বাচ্চাটা কেমন হয়েছে রে?

খালা কথা বলতে শুরু করলে থামতে চান না। উপরন্তু অনেকদিন পর পেয়েছেন দেশের লোক।

দেখতে খারাপ হয় নি। তবে স্বাস্থ্যটা খুব ভালো যায় না। বাচ্চার প্রসঙ্গ ছেড়ে আমি নিচু স্বরে বললাম, খালা, আমার মাদার আর্ট ছবিটা একজিবিশনে ফার্স্ট হল!

তাই নাকি, এতবড় খবরটা তুই এতক্ষণ চেপে রাখলি? ঘাড়ে গর্দানে মুটিয়ে যাওয়া খালা ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইয়ারিং দুলছে। প্রসাধন-বিশুষ্ক শক্ত চামড়ার গালেও পড়ছে টোল। উচ্ছ্বসিত [illegible] প্রশ্নের উচ্চারণে মুখের কোণে ফেনা দেখা দিল।

তাঁর উল্লাসটা আন্তরিক, শিল্পসাহিত্যের প্রতি বরাবরই আকর্ষণ ছিল, মাঝে মাঝে লিখেও থাকেন। বড়লোকের স্ত্রী, শখ প্রচুর; কিন্তু এ ধরনের শখ ক'জনের থাকে?

এখানে আসবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও করাচীকে মনে হয়েছিল শুকনো, হৃদয়হীন, রাতজাগা ধনী লম্পটের মতো। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, দু'দিনেই। এতক্ষণে একটু সহজ হলাম। গুনগুন গান জমে ঠোঁটের কোণায়। বাড়িটা সত্যি চমৎকার। আধুনিক স্থাপত্য রীতিতে তৈরি। ত্রিকোণ সিঁড়ি-বারান্দা, দেয়ালে গাঁথা ফিতের মতো ফুলের চাতাল। অবশ্য নকল মুক্তোর মতো, তবু রুচির ছাপ তো আছে খানিকটা? এটুকুতেই আমি খুশি। বাথরুমের টবে ঈষৎ গরম পানিতে অনেকক্ষণ ধরে গা ডুবিয়ে গোসল করার পর খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিই। মানুষ ও খাদ্যদ্রব্যে গাড়ি বোঝাই, আড়াইটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। খালার ছোট দুটো মেয়ে, মেকানিক ও ড্রাইভারসহ আমরা ছয়জন। তাছাড়া এক বাঙালি নব-দম্পতি এসেছেন। ঠাসাঠাসি করে বসেছি; তবু সকলের চোখেমুখেই স্ফূর্তির দীপ্তি, হালকা হাওয়ায় পালক মেলে উড়ে বেড়াতে কোনো ক্লান্তি নেই।

নীল আকাশ, তক্‌তকে রাস্তা, হরেক রকম মুখের সমারোহ, পৃথিবীটা সত্যি সুন্দর। গাড়ির শব্দের সঙ্গে ডুবিয়ে দুটি কলি গাই বারবার, কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ- ফাগুনের পালা, তারি মধ্যে চিরদিনের বইব গানের ডালা।

গাইছি বটে, কিন্তু ভাবছি অন্যকিছু। স্বামী বাইরে গেছেন, অথচ জোবেদা খালা নিজেকে নিয়ে বেশ আছেন, এই সূত্র থেকে চিন্তাটা ক্রমে বিস্তারিত হতে থাকে, বেগুনি মেঘের মতো। আসলে তার জীবনটাই তো বর্ণময়। ছোটবেলায় দেশের বাড়িতে দেখেছি দু'একবার, শাদামাটা বোকা বোকা চেহারা। টেনে টেনে কথা বলতেন। একটা সরল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ছিল তাঁর চলনে বলনে কাপড়ে জেওরে সর্বত্র। স্কুল-মাস্টার বাবা তাঁকে স্কুল-মাস্টারের হাতেই সঁপে দিয়েছিলেন কিনা। ছেলেটা আদর্শবাদী, দেশের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাবা খুবই স্নেহ করতেন, নিজের ছেলেদের চেয়ে বড়ো।

তাঁর নিজের ছেলেরা কলকাতায় গিয়ে তখন উন্নতির জন্য উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিল। একজন এক কুখ্যাত হোটেলে চাকরি নেয়, দ্বিতীয়জন খোলে মদের দোকান।

সেই সূত্রেই খান সাহেবের সঙ্গে পরিচয়। ভাবীর সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে গেলে জোবেদা খালার সঙ্গেও ভদ্রলোকের পরিচয় হয়েছিল।

উনি ডাকসাইটে মার্চেন্টই শুধু নন, পাক্কা মুসলমান। ভারতের প্রত্যেক বড় শহরেই যেমন তাঁর অফিস তেমনি মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ তিন জায়গায় তিন বিবি। প্রত্যেককেই বাড়ি করে দিয়েছেন এবং মাসোহারা নির্দিষ্ট। এক একজনের কাছে এক এক মাস থাকেন, প্রতি তিনমাস অন্তর পালাবদল। কলকাতায় এমন ব্যবস্থা ছিল না, সে জন্য অসুবিধে হত। এবং পরহেজগার হিসেবে সুন্নতও পুরা করতে চাইলেন।

স্কুল-মাস্টার আহাদের ইচ্ছা ছিল না বিবিকে তালাক দেন; বরং ভাইয়ের প্ররোচনায় তার পদস্খলন হওয়া সত্ত্বেও ফিরিয়ে আনতেই গিয়েছিলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন, জোবেদা সম্ভ্রান্ত মহিলা। প্রকাণ্ড পাকা বাড়িতে থাকেন । গেটে বিহারী দারোয়ান, চাকর-চাকরানী প্রচুর।

একটা পিস্তল জোগাড়ের চেষ্টা করেছিলেন কয়েকদিন; কিন্তু শেষে এমনিতেই ফিরে এসেছিলেন। এরপর আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

গান কখন থেমে গিয়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ খালার কণ্ঠস্বর কানে গেল, কি জাহেদ! চুপ হয়ে আছিস্ যে, কেমন লাগছে কিছু বল্।

বেশ ভালো! আমি হেসে বললাম, ক্লিফটন আর ম্যানোরা বুঝি আরও সুন্দর?

হ্যাঁ। খালা বললেন, তবে ক্লিফটন আমার ভালো লাগে না, আউটিং এর জন্য ম্যানোরাই বেস্ট্। আর চেঞ্জের জন্য হক্স্‌বে। সেখানে অনেকগুলো কটেজ হয়েছে। ওদিকে যেতে চাও নাকি?

আমার কোথাও যেতে আপত্তি নেই, দেখতেই এসেছি। তাছাড়া নতুন জায়গা মাত্রই আমার প্রিয়।

বেশ যাওয়া যাবে আর একদিন। কটেজ ভাড়া করে একদিন একরাত্রি ওখানে কাটানো যাবে।

আমি চুপ হয়ে থাকি। ভাবছিলাম, জীবন পদার্থটা আশ্চর্যরকম স্থিতিস্থাপক; যে কোনো অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারদর্শী। সে যতই নিষ্ঠুর হোক না

কিংবা অনাত্মীয়। সে খোলস ছাড়ে খোলস বদলায়। নতুন নতুন আচ্ছাদনে হয় চক্চকে বিচিত্রিত। আবার চরম ভাগ্যের সময়েও হারিয়ে যায় না, মরতে মরতে বাঁচে। ধুঁকতে ধুঁকতে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সরাসরি। সে মরে না, কারণ বেঁচে থাকাই তার ধর্ম।

জোবেদা খালার নবনব বেশ, নবনব রূপের উৎসও বুঝি এই ? কিন্তু একটি জিনিস এখনও রহস্যময়। যে বসন্ত এসেছিল, দেহমনকে সাজিয়েছিল রঙে রঙে মায়াবী নেশায় সে যখন চলে গেল ঝরাপাতার সঙ্গে তাঁর সমস্ত স্মৃতিও কি চির অবলুপ্ত হয়ে গেছে? আজকে অন্য ঋতু অন্য পরিচ্ছদ, কিন্তু পূর্বরাগিনীর সামান্য অংশও কি এর অন্তরালে লুকিয়ে নেই? তা জানতে বড্ড ইচ্ছে।

গাড়ি থেকে নামবার পর জেটির ধারের একটি পালের নৌকা ভাড়া করে উঠে পড়লাম আজ শনিবার, ভীড় মন্দ নয়। অনেক দল উপদল, বিভিন্ন জাতের মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে পড়েছে। সমস্ত খাঁড়িটা জুড়েই জাহাজ, নৌকা, লঞ্চের আনাগোনা। চেয়ে চেয়ে দেখি, যেন একটা গতিময় ছবি, নৌকোর গলুইয়ের কাছে বসে স্কেচের খাতাটা খুললাম। ছোট মেয়েদুটো কৌতূহলী হয়ে কাছে এল।

বাইরে অবশ্যি কাজ করছি, কিন্তু ভেতরটা শান্ত হয় নি। ম্যানোরায় গিয়েও নয়। সামনে আরব সাগর, অন্তহীন খোলা সমুদ্র, একটানা হাওয়ার সঙ্গে ফেনিল ঢেউ সরসর শব্দে আছড়ে পড়ছে। বালির ওপরে লেপটে বসে চা খাওয়া, সমুদ্রে নামা, স্বল্প পানি মাড়িয়ে অনেক দূরে হেঁটে যাওয়া, হাসি ঠাট্টা তামাসা হৈ-চৈ চিৎকারের মধ্যে আমার সারাক্ষণের নিভৃত চিন্তা একটি ছোট্ট ইচ্ছেয় এসে কেন্দ্রীভূত হল। একটা জিনিশ শুধু পরীক্ষা করে দেখব আমি একটা জিনিশ যার ওপরে আমার সমগ্র সৃষ্টিকেই দাঁড় করাতে চাই। সে হল জীবনের উৎসমূলে অবগাহন।

সূর্য ডুবেছে, নেমে আসছে ছায়া অন্ধকার। ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়েছে সবাই, ফেরার সময় হল। আমরা হাঁটছিলাম পাশাপাশি, কিছুদূরে চলে এলাম। সমুদ্রের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হঠাৎ আমি কথা বলে উঠি, আচ্ছা খালা একটা প্রশ্ন জিগ্‌গেস করলে কিছু মনে করবেন না তো?

আমার কণ্ঠস্বর এমন একটা খাদ থেকে বেরিয়ে এল যে চমকে উঠলেন জোবেদা খালা। হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কি যে তুই বলিস, মনে করবার মতো কি এমন কথা?

না তেমন কিছু নয়। আমি অকম্প গম্ভীর স্বরে জিগ্‌গেস করলাম, আচ্ছা, আহাদ সাহেবকে আপনার মনে পড়ে না?

কে ? বিকারগ্রস্ত রোগীর মতোই তির্যক প্রশ্ন।

আহাদ সাহেব, আপনার প্রথম স্বামী। এরপর কি ঘটল বলতে পারবো না, একটা চোরাবালির ধ্বস বুঝি নিচে ডেবে গেল আচমকা। আসলে এটা আমার মনের ভুল । আর্তনাদের মতো একটা অস্ফুট শব্দ করে জোবেদা খালা বসে পড়লেন শুধু। নিচু হয়ে আমি শুধিয়ে উঠলাম, কি হল, খালা?

কিছু হয় নি জাহেদ! আমাকে একটু ধর তো! একেবারে নির্বাপিত শীতল কণ্ঠস্বর। হাত ধরে তুলতে গিয়ে দেখি তার দুই চোখ বেয়ে দর্‌দর্‌ ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট কাঁপছে। এরপর থরথর করে সমস্ত শরীরটাই কাঁপতে লাগল। বিস্মিত হওয়ারও সময় নেই। মুখটা একবার আকাশের দিকে তুলে পরক্ষণেই একটা তীব্র কাতরানির সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন বালির ওপর।

বেশি দূরে ছিল না, আর্তনাদ শুনে সবাই ছুটে এল। সকলের মুখে একই প্রশ্ন, কি হল?

আমি তখন আত্মস্থ শান্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বললাম, বড় মামার ছোট ছেলেটা মারা গেছে বলতেই কেমন হয়ে গেলেন!

আরও কত ঘটনা! ছোটবেলায় কঠিন অসুখ হয়েছিল; নাড়ি বন্ধ, মরে গেছি বলে বাড়িতে ক্রন্দনের রোল উঠেছে এমন সময় সবাই অবাক হয়ে দেখে আবার শ্বাস নিচ্ছি

পরে একজন আত্মীয় নাকি বলেছিলেন, এ ছেলে জীবনে কিছু করবে, নইলে এমনভাবে বেঁচে উঠল!

জানিনে কথাটা কতখানি ঠিক। তবে যে ক্রমে কেন্দ্রীভূত ও আত্মস্ত হয়ে যাচ্ছি তা স্পষ্টই বুঝতে পারি।

পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল বলে আমাদের পাশের বাড়ির জহু ফাঁস নিয়েছিল গিয়ে দেখেছি, সতেরো বছরের ওর ডাগর দেহটা গাছের ডালা থেকে ঝুলছে, চোখ ওলটানো, জিভটা বেরিয়ে পড়েছে, খানিক বিশ্রী বিদঘুটে চেহারা। জহু ছিল মুখরা, হরিণীর মতো চঞ্চলা, বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত উড়োচুলে, দেখা হলেই বলতো, আমার একটা ছবি একে দে-না রে জাহেদ, তোকে আমি একটা চৈতা শালিকের বাচ্চা দিব নে। মুন্সীবাড়ির আমগাছের বাসায় ডিম পেড়েছে।

কিইবা আঁকতাম তখন, আমার পেন্সিলের কাজ ড্রয়িং মাস্টার খুবই প্রশংসা করতেন এইমাত্র।

তবু অনেকদিন বলার পর জহুকে নিয়ে বসলাম একদিন, স্কেচের খসড়াও একটা করলাম।

কিন্তু ওটা শেষ করার আগেই ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আর আসতে পারে নি।

দুই

শুরুটা ভালো ছিল, কিন্তু আমার কাছে শেষটাই বরং দামী। নৌকায় তুলতে ও খাঁড়ি পেরনোর পর নৌকা থেকে গাড়িতে উঠিয়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতে বেশ কষ্ট হল বটে ; তবু পাওনার তুলনায় সেটুকুন কিছুই নয়।

বন্ধুরা অভিসারী, আর আমি কামরার ভেতর বালিশে হেলান দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে কাত হয়ে আছি। জানালা খোলা। দেখা যাচ্ছে নগরীর লাল নীল সবুজ আলোকমালা হঠাৎ গুপ্তধন পেয়ে যাওয়ার পর কৃপণের মতো আমি শিহরিত, সতর্ক তাই বাইরের ঠিকরানো হাতছানি চোখে পড়লেও ভেতরে কোন সাড়া তুলছে না। বরং আমি ক্রমে নিজের ভাবনার রেশমী জালের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছি।

জীবন বারবার নিজেকে আমার কাছে অনাবৃত করে ধরেছে এটাই আশ্চর্য। আচমকা একেকবার পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে অঙ্গুলি- সঙ্কেত করেছে ভেতরের দিকে, এই রঙ্গমঞ্চ। তার পাশেই সাজঘর। সেখানে আসলরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে অভিনেতা-অভিনেত্রী, কোনো প্রসাধন নেই আবরণ নেই। বাইরে যাদের চেনা যায় না সেখানে তারাই নিজ নিজ বেশে প্রতিষ্ঠিত। দেখতে ভয় লাগে কিন্তু একবার দেখতে শিখলে তার ভয়ঙ্কর নেশাই পেয়ে বসে।

হয়তো কিছু চাওয়ার আছে আমার কাছে জীবনের, নইলে ধরা দেবার জন্য কেন এত আগ্রহ?

অনেকদিন রাত্রে একলা বিছানায় শুয়ে আমি ভেবেছি কেন এমন হল? হঠাৎ কানে বেজেছে কার কণ্ঠস্বর। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে জহু যেন বলছে জাহেদ আমার ছবিটা শেষ করবি না?

চমকে উঠে একদৌড়ে ওখানে গিয়ে দেখি কেউ নেই, হাস্নাহেনার ঝাড়গুলা শুধু হাওয়ায় কাঁপছে।

জহুর ছবি আর শেষ করতে পারিনি, মনের কোণায় স্কেচটুকু শুধু জমা আছে; যেদিন শেষ করতে পারব সেদিন বুঝব শিল্পী হয়েছি। আরও কত কাহিনী! কিছু স্বাভাবিক, কিন্তু বেশির ভাগই আকস্মিক।

আজও তাই হল। জোবেদা খালার স্বামী যে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন এবং বহুকাল পর ফিরে এসে নিজের ভাঙা ভিটেটার ওপর পড়ে গত বছর মরেছেন তা আমি বলিনি, তবু সে কি প্রতিক্রিয়া! একদম অবিশ্বাস্য। প্রথম যৌবনের সেই একজন সত্যইকি ছিল তার প্রেমপাত্র? যদি ছিল তবে কেন বেছে নিলেন অন্যপথ?

নিজের উর্ধে উঠতে পারাটাই শিল্পী ব্যক্তিত্বের সর্বপ্রথম অঙ্গীকার। এবং সে আমারও লক্ষ্য। এখন শেষ দুঃখ শেষ সুখের সামনে মূর্ছিত হয়ে পড়ি না এতেই আমি সন্তুষ্ট।

বসুন্ধরা ছবিটা প্রথম প্রদর্শনেই সমালোচক ও সমঝদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এতে আমি সুখী। প্রতিষ্ঠা ও যশ শিল্পী মাত্রেরই কাম্য এবং আমিও সেটা চাই। কিন্তু

তবু বলতে পারি, ছবিটা হলঘরের এক কোণায় অনাদরে পড়ে থাকলেও খুব দুঃখিত হতাম না কারণ আমার যা আসল পাওনা, তা পেয়ে গেছি অনেক আগেই। সে হল আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ। সে আনন্দ, আনন্দের চেয়ে তীব্র বেদনার চেয়ে গভীর, মৃত্যুর চেয়ে অনন্ত। এবং তখন আমিই তো নায়ক ছিলাম না? হ্যাঁ তাই, আমি ছিলাম না তখন। আমি ছিলাম ইজেলে সাটানো ক্যানভাসের সামনে, রং সাজিয়ে তুলি হাতে, নির্ঘুম সারারাত; কিন্তু রচনা করেছিল সে আর একজন। বর্ষণ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝটিকার মেঘে আকাশটা ঝিম ধরে ছিল, যখন ভেঙে পড়ল, পরিচিত আমিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অন্যজন হল সৃষ্টির সারথি। আমার দেহের অভ্যন্তরেই জেগেছিল সে বিধাতার মতো, অচেনা রহস্যময় আমার হাত দিয়ে ক্যানভাসের ওপর কাজ করে চলে গেছে। তাকে চিনি না, কিন্তু তবু মনে হয় সে-ই তো জেগেছিল রাফেল দাভিঞ্চি মাইকেল এঞ্জেলোর মাঝে, গগাঁ রেনোয়া পিকাসোর আত্মায়?

এজন্যই বুঝি রাতটা অপরূপ হয়ে এসেছিল। আমাদের ছোট ঘরটার জানালার পাশে একটি নারকেল গাছ চিরল-চিরল পাতায় ছাওয়া, শেষ রাত্রে তার ফাঁকে এসে পড়ল হলুদ চাঁদের আলো। দূরে কোথায় যেন গান হচ্ছিল। এমপ্লিফায়ারের সেই সুর তরঙ্গ দমকা হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসছিল। সে যেন এক সুরলোকের অশ্রুতপূর্ব মধুর রাগিণী।

হঠাৎ কেন জানি তুলিটা হাতে নিয়েই একবার উঠলাম। মাঝের কপাটটা ঠেলে চুপি চুপি শোবার কামরায় ঢুকি । হ্যাঁ ছবি ঘুমোচ্ছে তার কোলের কাছে টুলটুল। হাওয়া আর চাঁদ যেন মিতালি পাতিয়েছে। একজন জানালার পর্দা উঠিয়ে ধরে অন্যজন বুলিয়ে যায় মায়াবী হাতের ছোঁয়া আশ্চর্য সুন্দর মা ও শিশু এই তো বসুন্ধরা, দুঃখে দুর্ভিক্ষে দারিদ্র্যে ছিন্নভিন্ন কিন্তু তবু মরে না, তার স্নিগ্ধ শান্ত চোখের চাওয়ায় যুদ্ধের শিবির ভেঙে পড়ে। তার খুশির হাতছানিতে দোলে ধান গম ভুট্টার ক্ষেত সোনালি খামার নদীর তরঙ্গধারা।

আমি তন্ময় হয়ে দেখছি, এত পবিত্র এই দৃশ্য ওর কপালে একটা চুমু খেতেও সাহস হল না।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র প্রশংসিত হয়েছে এবং বাজার অনুযায়ী দামও কম পায়নি, যদিও কাজের দাম বলতে আমি বুঝি অন্য কিছু। কিন্তু তবু কথা থাকে। সমালোচকেরা দেখেছেন কমপোজিশন রং আয়তন মাত্রা বিভাগ, বক্তব্য চোখে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস লাগিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং তারা ভুল করেন নি। কিন্তু একটি কথা তাঁরা কখনো জানতে পারবেন না, সে হল এই ছবির জন্মকাহিনী। নিজের উর্ধে যখন উঠি তখন বরং বলি জীবনই নিজেকে প্রকাশ করেছে, আমি নিমিত্ত মাত্র।

লুভ্যর ন্যাশন্যাল গ্যালারী, মিউজিয়াম অব মর্ডাণ আর্ট কোনদিন যেখানেই এই ছবি যাক না কোনদিন এও কেউ জানতে পারবে না যে আমার ছবিই এই ছবির জন্মদাত্রী। কারণ চতুস্কোণ কাম্বিসের স্থানটুকুর মধ্যে একজন মানবীর মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে, মূর্তি হিসেবে সে বিশেষ কিছু নয়। এবং অনাগতকালে আমিও থাকব না,

ছবিও থাকবে না থাকবে না টুলটুলও । হয়তো থাকবে শুধু এই ছবি যার নাম মাদার আর্থ, বসুন্ধরা, ক্যাটালগে তালিকাব্ধ তেইশ নম্বর তৈলচিত্র।

অন্তত এই ছবিটির বেলায় সামান্য সময়ের জন্য হলেও জীবন আমাকে শিল্পী করেছিল। আর ছবিই সেই জীবন।

অথচ যেদিন প্রথম দেখা হল তখন বুঝতেও পারিনি এই হাবা মেয়েটিই আমাকে নিয়ে যাবে ঝর্ণার উৎসের কাছে।

দোকানে রঙের টিউবগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। একজন লোক প্রবেশ করলেন হঠাৎ। ছেঁড়া শার্ট ময়লা পায়জামা, পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল। গাল আর চোখজোড়া গর্তে ঢুকে গেছে। আ-ছাঁটা চুল ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে বিপর্যস্ত চেহারা।

একটা কাজ পেয়ে গেছি, দুটো রং দিতেই হবে হোসেন সাব, ব্লু আর রেড। বিকেলের মধ্যে কাজটা সেরে সন্ধ্যায় টাকা নিয়ে রাত দশটার আগেই রঙের দামটা দিয়ে যাব। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও ছবি আঁক নাকি হে ?

জানা নেই শোনা নেই একেবারে তুমি সম্বোধন! বয়সে না-হয় একটু ছোটই হব কিন্তু ভদ্রতা বলে একটা জিনিশ তো আছে? তবু ঝগড়া করা বৃথা। বললাম, এই কিছু কিছু।

খাসা জবাব। কিন্তু জান থোড়াই হোক বেশিই হোক সেই একই ব্যাপার! বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজা! চুরিচামারিরও একটা দাম আছে, কিন্তু ছবি আঁকার নয়।

নাম বলতেই শো-কেসের ওপর থেকে আমার হাতটা টেনে নিয়ে করমর্দন করলেন লোকটা খ্যাপা নাকি?

জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে চেনেন আপনি?

কিছুটা! স্কুলের গত এক্সজিবিশনে ছাত্রদের মধ্যে তোমার কাজই আমার সবচে ভালো লেগেছে, তোমার কম্পোজিশন আর ডাইমেনশন জ্ঞান চমৎকার, ড্রয়িং ভালো রং এখনো বোঝনি তবে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। একটানা কথাগুলো বলার পর দোকানীর চোখের সামনেই দুটো টিউব তুলে নিয়ে বললেন, চল একটু আমার সঙ্গে কথা আছে!

ছবির দাদা জামিলের সঙ্গে এই ভাবেই পরিচয়। প্রথম দিনেই গলির ভিতরে তার ভাঙাচোরা বাসার অন্দরে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুকামরার বাড়ি ইট সুরকি ভেঙে পড়েছে কেমন স্যাঁতসেতে, একটি ঘর কিছু বড় আরেকটি ছোট। সেটার মধ্যে তার স্টুডিও তার একধারে ছোট্ট একটা চৌকি! রাত্রে হয়তো থাকে কেউ।

স্টুডিওটা মূর্তিমান জঙ্গল। ফ্রেম রং কালি তুলি কাগজ বিড়ির টুকরো বিজ্ঞাপনের ছবি গাদাগাদি ছড়াছড়ি। ঘরটা বছরেও একবার গুছানো হয় কিনা সন্দেহ। গুছিয়ে দেয়ার কেউ নেই এমন নয় তবে পরে জানতে পেরেছিলাম। জামিলই তা করতে দেন না। পরিপাটি দেখলেই নাকি প্রায় পাগল হয়ে যান এবং হাতের কাছে যা পান তাই নিয়ে মারতে আসেন।

ছবি! ছবি! স্টুডিও ঘরে ঢুকেই জামিল ডাক দিলেন, একটা প্যালেট টেনে নিয়ে আমাকে বললেন, একটু ধর।

তখন হালকা সবুজ রঙের সস্তা শাড়ি পড়া আলুথালু বেশ একটি মেয়ে চৌকাঠে পা দিচ্ছিল কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়েই আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে! এদিকে আয় পরিচয় করিয়ে দিই, জাহেদুল ইসলাম, আর্ট স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের ফার্স্ট বয়, খুব ভালো ছেলে!

কিন্তু ছবি আড়াল ছেড়ে এল না। আমি ওর মনটা যেন বুঝতে পারলাম, বললাম, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে পরিচয় হবে।

জামিল এটা সেটা নাড়াচাড়া নিয়ে ব্যস্ত, কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ছবি! চুলায় আগুন আছে রে?

না! মিষ্টি গলার ছোট্ট একটা শব্দ।

আগুন জ্বালতে অসুবিধে হবে?

না

তাহলে আমাদের দুকাপ চা দে না! জামিলের কথাবলার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করার মতো, যেন দীন হীনের কাতর প্রার্থনা। ছবি দরজার কাছে থেকে চলে গেলে আমাকে বললেন, কিছু মনে করো না ভাই জাহেদ, আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে । দুটো বিজ্ঞাপন একটি ডিজাইন তুমি করে দাও। ডিজাইন দুটো ঠিক সময়ে দিয়ে কিছু টাকা না নিতে পারলে সত্যিই বিপদ।

উত্তম পরিচয়! এ না হলে কি আর শিল্পী! জীবনকে ইতিমধ্যেই কিছু দেখেছি কাজেই অবক হলাম না। একটু ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু আমি যে কমার্শিয়াল আর্ট করি না।

কর না? খুব ভালো কথা। জামিল বললেন, হ্যাঁ কমার্শিয়ালে ঢুকে গেলে আর্টকে ভুলে যেতে হয় অনেক সময়। কিন্তু এদেশে শুধু আর্ট নিয়ে থাকতে পারবে কি না সন্দেহ। পাশ করে বেরোও সব দেখতে পাবে। তোমাকে আজ এ-কাজটা করতেই হবে। এরকম তো আর করতে যাচ্ছ না তুমি? একটা ড্রয়িং শুধু কপি করে দেওয়া।

ঠিক আছে বলে দরজার দিকে চাইতেই দেখি ছবি, এবারে সে ওর মুখের অর্ধেকটা ও একটি চোখ আড়াল থেকে নিয়ে এসেছে এবং আমি চাইলেও তা সরিয়ে নিল না। তেল না দেওয়া অবিন্যস্ত চুল কেমন করুণ চেহারাটি যেন নীরব অশ্রুজলে মলিন হয়ে যাওয়া। আমার দিকে সে চাইল, একেবারে শূন্য, ভাবলেশহীন দৃষ্টি। পরে আস্তে করে ডাকল, দাদা!

জামিল প্যালেটে রঙ তৈরি করছিলেন, আমি ধাক্কা দিয়ে বললাম, আপনাকে ডাকছে!

কে? বলে মুখ তোলার সঙ্গেই বললেন, ছবি? কি ব্যাপার?

জামিল উঠে যেতে ছবি তাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল।

একটু পর ফিরে এসে চৌকাঠের কাছে থাকতেই সশব্দে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, কি ব্যাপার! হাসছেন কেন?

কারণ ঘটেছে তাই। আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববে তুমি, তাই ভেবে আমার হাসি পেল। এই প্রথম দেখ, অথচ কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!

না, না, সে কিছু নয়! আমি বললাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বরং আমার লাভই হল অনেক কিছু শিখতে পারব। কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র আপনি, বড় বড় গুণীর সঙ্গে কাজ করেছেন।

হ্যাঁ তা বটে। তা বলতে পারো! জামিলের কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারী হয়ে এল, বললেন, টিচাররা আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। আমি কাজও করতাম মন্দ নয়। যাগ্‌গে, ওসব কথা। বলছিলাম কি প্রথম পরিচয়, তোমাকে ডেকে এনে কাজে লাগালাম তারপর দ্যাখ চা খাওয়াতে বললাম, ছবি বলে চায়ের পাতা নেই- কেনার পয়সাও যে নেই। তাই হাসছিলাম, পরিচয় যখন হয়েছে দেখে যাও আমাদের অবস্থা।

অজান্তেই আমার মুখটা লজ্জায় ছেয়ে গেল। বললাম, যদি কিছু মনে না করেন, আমার কাছে পয়সা আছে। চা কিনে নিয়ে আসি।

না তুমি যাবে কেন, আমার কাছে দাও।

না-না আমিই যাই। কোনো অসুবিধে হবে না। আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দারিদ্র্যকে ঘৃণা করি কিন্তু অন্যের দারিদ্র্য মোচনের ক্ষমতাও নেই এক পয়সা দু'পয়সা সাহায্য দিয়ে সে অসম্ভবও বটে। সমাজের কাঠামোটাকেই পাল্টে দিয়ে দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই আমার সংকল্প। সেজন্য ভিক্ষে কখনো দিইনে। ভিক্ষুককে কিছু দেয়ার মানে ভিক্ষাবৃত্তির পোষণ এবং ভিক্ষুকের জাতি দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু এখানে সে ব্যাপার নয়। অবস্থাটা এত স্পষ্ট ছলনার প্রয়াসটুকু পর্যন্ত অনুপস্থিত। কেউ হয়তো বলবেন এ অন্য ধরনের প্রতারণা। ভদ্রতার আবরণে না ঢেকে খোলাখুলি হয়ে যাওয়ার মধ্যে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অধিকতর জোরালো ভঙ্গিটাই বর্তমান। কিন্তু আমি বলি ঘরে যে কিছু নেই এটা তো আর ছলনা নয়? জামিল যে ক্ষুধার্ত এটাও ছলনা নয়? ছবির মুখটা গভীর করুণ এখানে কোথায় ছলনার চিহ্ন?

হ্যাঁ, ঘরে কিছু নেই, চা, চিনি কিনতে গিয়ে আমার মনে হল ঘরে চাল-ডাল কিছুছুই হয়তো নেই।

পকেটে পাঁচটি টাকার একটি নোট ছিল। রং কেনবার পয়সা। সবটা খরচ করে ফিরে এলাম।

বড় কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাক দিলাম, ছবি! ছবি!

ছবি প্রথম বুঝতে পারেনি, বারান্দায় পা দিয়েই হকচকিয়ে উঠল। কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়ে সরে গেল না। দ্রুতপদে কাছে যাই। চটের থলেটা ওর দিকে বাড়িয়ে

দিয়ে বললাম, এই নাও। ছবি থলেটা হাতে নিয়ে বলল, এসব কেন। দাদা জানতে পারলে খুব রাগ করবেন।

সে জন্যই তোমাকে দিচ্ছি। ওকে জানিও না, আর কিছু মনে করো না তুমি লক্ষ্মীটি!

ছবির চোখের মনি আমার দিকে হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল; কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। মাথাটি নিচু করে চলে এলাম। আমি তো সজ্ঞানে এই কথাটি উচ্চারণ করতে চাইনি? তবে কেন এমন হল? ও নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছে, নইলে প্রতিবাদ করত।

এরপর বিজ্ঞাপনের ডিজাইন আঁকতে আর বলতে হল না-জামিল কাজ করছিলেন; আমিও তুলি টেনে নিয়ে বসে যাই। আশ্চর্য, একি হয়ে গেল। আমি তো চাইনি এমন কিছু? আমি জানতে পারিনি অতি সাধারণ শাড়িপরা দুঃখের দুলালী এই নিরাভরণ মেয়েটি কখন আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে। অল্পক্ষণের পরিচয়, তাতেই যে বেদনার সরোবর টলমল করে উঠল, আমার ছোট্ট সম্বোধনটি হয়তো তার থেকে জন্ম নেওয়া লালপদ্ম!

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো একমনে কাজ করে চলেছি, সর্বক্ষণ মনের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন আলোড়ন!

ছবি চা নিয়ে এলে আমি আর চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না। একটা চুমুক দিয়ে জামিল বললেন, প্রথম দিনেই আমাকে ঋণী করে ফেললে জাহেদ । এ আমি সাধারণত স্বীকার করি না। কিন্তু তোমার প্রতি একটা দুর্বলতা জাগল, ভালোমত বাধা দিতে পারিনি।

আমি বললাম, আপনি বড্ড বেশি ভাবেন, নইলে বুঝতেন এ ব্যাপারটাকে ঋণ বলা যায় না কিছুতেই।

এরপর নীরবতা। হিমানী কেশতৈলের লেবেল, চৌকোণো ঘরে স্বদেশী চিত্রতারকার ছবি থাকবে, অবশ্যি চেহারার একেবারে কপি নয়, অনেকটা মিল শুধু। ফটোগ্রাফ থেকে হুবহু মেরে দিলে আইনের আওতায় পড়তে পারে, অথচ ক্রেতাদের আকর্ষণ করবার জন্য দেওয়াও প্রয়োজন। তাই দুইয়ের মধ্যে একটা সমঝোতা এটা আমিই করছি। আর উনি করছেন একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন।

ছবির ডাকে মাঝখানে একবার উঠে গেলেন জামিল, খানিকক্ষণ পরে হাসিমুখে ঘরে ঢুকতে বললেন, তোমাকে আজকে এখানে খেতে হবে জাহেদ। অবশ্যি দাওয়াতটা আমার নয় ছবির। কাজেই বুঝতে পারছ না বলার কোনো মানে নেই!

আমি বললাম, ভোজন জিনিসটা সর্বদাই আমার কাছে লোভনীয়, কাজেই সে আশঙ্কা বৃথা!

জামিল হেসে বললেন, আমার সঙ্গে তোমার বেশ মিল দেখছি! খাদ্যবস্তুর প্রতি আমারও ভয়ানক দুর্বলতা। একদিন ছিল---

হঠাৎ থেমে গেলেন। কেন জানি মুখে বিষন্নতার ছায়া নেমে এসেছে। আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, থামলেন কেন, শেষ করুন।

না ভাই! আজ নয়। সব জিনিশ , আস্তে ধীরে জান ই ভালো। তাতে অন্তত কৌতূহলটা বজায় থাকে। এবং তার দাম কম নয়।

এভাবেই ভাইবোনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল খানিকটা অস্বাভাবিক কিন্তু অসাধারণ কিছু ছিল না। খেতে বসে জামিল বলেছিলেন, জানো জাহেদ, ছবি সত্যিই ভালো মেয়ে। ও না থাকলে আমি রাস্তায় পড়ে মরতাম। তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, দু'দিন বাজার করতে পারিনি কিন্তু তবু ঠিক সময়ে খাবার পেয়েছি। কোত্থেকে যে সে যোগাড় যন্ত্র করে আনে আমি বুঝি না।

ছবি এতক্ষণ কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে তদারক করছিল, নিজের সম্বন্ধে কথা শুনতে পেয়ে আড়ালে চলে গেল।

ও কোথাও চলে গেলে আমার কি অবস্থা হবে মাঝে মাঝে তাই ভাবি .

এতক্ষণ কথা বলতে পারছিলাম না, এবার সুযোগ পেয়ে বললাম- চলে যাবে কেন?

জামিল সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি দেখছি সত্যি ছেলেমানুষ। চলে যাবে কেন! আছে যে এটাই বিচিত্র। মেয়েদের বিশ্বাস নেই রে ভাই!

উনি যখন কথা বলছিলেন সামনের দেয়ালে টাঙানো ফটোটার দিকে চেয়ে ছিলাম। নিঃসন্দেহে জামিল এবং তার বৌ। বিয়ের পোশাকে তোলা ছবি মেয়েটার কপালে টিপ। বেনারসী শাড়ির ঘোমটা টানা সলজ্জ মধুর মুখখানি। কাটা সুন্দর চেহারা জামিলের গায়ে পাঞ্জাবী, মাথার চুল বড়ো-বড়ো ঘাড় অবধি নেমেছে। প্রশস্ত কপালের নিচে চোখজোড়া উজ্জ্বল। গাল তোবড়ানো নয়। ছবিটা নষ্ট হয়নি। খুব জীবন্ত মনে হচ্ছে।

কোনদিন প্রকাশ না করলেও আমার জানতে দেরী হয়নি। কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র জামিল চৌধুরী সহপাঠিনী মীরা দাশগুপ্তার প্রেমে পড়েছিলেন। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আউটডোর স্কেচ আর পিকনিকের আড়ালে চলত তাদের মন দেওয়া-নেওয়া। সুযোগ মতো লম্বা লম্বা-চিঠির আদান-প্রদান। আগুন কখনো ছাই চাপা থাকে না। এ ব্যাপার নিয়ে সে কি কানাঘুষা হৈ চৈ! জামিলের প্রাণই বিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র মীরার গুণে শেষ পর্যন্ত আদালতে দুজনের বিয়ে হতে পারল। দিনটা ছিল সতেরোই আগস্ট উনিশ শ' সাতচল্লিশ সন; লোকের প্রবাহের সঙ্গে সেদিন বিকেলের ট্রেনে ওরা চলে এসেছিলেন ঢাকায়।

অথচ এখন দু বছর ধরে ছাড়াছাড়ি! ছবি হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, বৌদির একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মে গেছে। তার ফলেই এই কাণ্ড। দুটি ছেলেমেয়ে আছে। দাদার সঙ্গে থাকলে নাকি ওরা মানুষ হতে পারবে না!

তাই নাকি? আমি বিস্মিত স্বরে জিগ্‌গেস করলাম।

ছবি বলল, হ্যাঁ তাই। সেজন্যই তো আলাদা থাকেন। বৌদি মেয়েদের স্কুলে ড্রয়িং টিচার।

কোনদিন এখানে আসেন না উনি?

দাদা না থাকলে মাঝে মাঝে আসেন। বিছানাপত্র গুছিয়ে দিয়ে যান.

ছবি একটু থেমে বলল,

কিন্তু সেটা আরো বিশ্রী। দাদা বুঝতে পারেন তো? একদম লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে তোলেন।

সেদিন দুর্বল মুহূর্তেই যেন ছবি কথা বলতে শুরু করেছিল, হঠাৎ সচেতন হয়ে একদম চুপ হয়ে গেল।

তিন

শুধু সেদিনই নয়। ছবি এমনি, কেমন মায়াময়ী; চোখজোড়া স্বপ্নাচ্ছন্ন, গতি ধীর মন্থর। অতি কাছে থাকলেও অনেক দূরে। দেখলে মনে হয় চেতনাজগতে তার বাসস্থান বটে কিন্তু এক অদৃশ্য অচেনা লোকেরই সে বাসিন্দা। যখন একলা থাকে কি এক ভাবনায় নিমগ্ন, কাছে গেলেও টের পায় না। এক ডাকে শোনে না। হঠাৎ স্বরটা কানে গেলে হকচকিয়ে যেন জেগে ওঠে। কথা বলে কদাচিৎ কিন্তু বলতে শুরু করলে নিজের কথাগুলো শেষ করে চুপ হয়ে যায় একদম। মুখ নিচু করে রাখে, নয় স্থিরদৃষ্টিতে থাকে চেয়ে। সরল বোকা-বোকা চাউনি।

কাছে যাওয়ার সুযোগ আছে অথচ কাছে গেলেও নাগাল পাওয়া যায় না, এর আকর্ষণ বড় তীব্র বড় মধুর। সেই সোনার শেকলে কখন বাঁধা পড়ে গেলাম বলতে পারব না। প্রতিদিন অন্তত একবার ওখানে না গেলে ভালো লাগে না এইমাত্র বুঝি। ছবি কখন নিঃশব্দ পদে আমার স্কেচে আমার ড্রয়িংয়ে অলস মুহূর্তের হিজিবিজি আঁকাবুকির মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেও বহুদিন অজ্ঞাত ছিল।

একদিন দেখি পরিচয় হওয়ার পর থেকে যত নারীমূর্তি এঁকেছি, প্রত্যেকটিতেই ওর আদল, কোনোটায় মুখের গড়ন, কোনোটায় দেহের ভঙ্গি, কোনোটায় চোখের দৃষ্টি। আমি সজ্ঞানে কোনোদিন ওকে আঁকতে চেয়েছি বলে মনে পড়ে না অথচ এমন, এর অর্থ কী অলৌকিক কিছু নয়, হবে নিশ্চয়ই রহস্যময়।

এ রহস্য যন্ত্রণারও জন্ম দেয় তা একদিন বুঝলাম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল চৌকাঠের পাশের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে চাপানিটা খুলে ভেতরে যাই। কুয়োর কাছের ডালিম গাছের কয়েকটি কাক ছাড়া বাড়িটা নিরলা নিঝ্ঝুম। অনেক সময়ই এরকম থাকে কাজেই তা অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু আজকে বারান্দার সিঁড়ি মাড়িয়ে উঠতে আমার হৃৎপিণ্ডটা টিব্‌টিব্ করতে থাকে । আশ্চর্য এ কি অভিজ্ঞতা! আমার মস্তিষ্কের শিরা বেয়ে শিরশির করে রক্ত উঠছে কেন? চোখদুটো ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে! তাড়াতাড়ি স্টুডিওতে গেলাম, হাতের কাগজপত্রগুলো রেখে দাঁড়িয়ে পড়ি, এ কি আমি কাঁপছি! কম্পিত বুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি মেঝের ওপর ছবি ঘুমোচ্ছে! শিথিল বসন গভীর ঘুমে সে মগ্ন! সুডৌল পরিপূর্ণ দেহ! সুন্দর ঠোঁটজোড়া!

এতক্ষণ যা টিম্‌টিম্ করছিল এবার এক নিমেষে তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

আমি কি করি এখন আমি কি করি? সারা দেহে উথলে ওঠা থর্‌থর্ যন্ত্রণার ভার যে আর সইতে পারছিনে।

এক অদ্ভুত ঝড়ের ওপর আমার কোনো হাত নেই, সে জেগেছে হয়তো নিজের নিয়মেই কাজেই ভীরুতার প্রশ্ন অবান্তর। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। ছবির শিয়রের কাছে বসে এবার আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। কিন্তই সেও কয়েক মুহূর্তের জন্য। ওর মাথার চুলের দিকে ডান হাতটা এগিয়ে নিতে চাইলে হৃৎপিণ্ডের তলা থেকে উঠে আবার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেই কাঁপুনি।

নারীর দেহ বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি কথাটা শুনেছি; কবিতায় চিত্রে সঙ্গীতে ভাস্কর্যে তার স্তবগাথা মনে মায়াজালের বিস্তার করেছে। কিন্তু সেই নারীদেহ যে নীরবে জলতে থাকা গন্‌গনে ধাতুর মতো অগ্নিপিণ্ড,বাইরে অনেকের সংস্পর্শে এলেও তা কোনদিন উপলব্ধি করিনি। মোহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছি শুধু। ছবিও তো অনেকবার কাছে এসেছে? কিন্তু অন্যের উপস্থিতিতে যা ছিল প্রচ্ছন্ন আজকের নির্জনতার সুযোগে তাই ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। একে কি করে দমিয়ে রাখব? অথচ ও টের পেলে নিমেষে আমার মুখোশটা খুলে পড়বে এবং যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হই সেই বিপর্যয়কে কি মেনে নিতে পারব?

পারি বা না পারি সেই হবে ভালো। ঝর্ণার উৎসমুলে যাওয়ার এই মাহেন্দ্রক্ষণকে ভীরুতার জন্য হারালে অনুশোচনার অবধি থাকবে না।

শিয়র থেকে উঠে যাওয়ার পর ডানপাশে বসে ওর বুকের ওপর থেকে একটা হাত তুলে নিই। গোলগাল সাধারণ একটা হাত কিন্তু কি অদ্ভুত এর জাদু! আমার শিরায় শিরায় দ্বিগুণ বেগে বহ্নি ছড়িয়ে দিল। কিন্তু এটা হয়তো নয়। আমার চোখের সামনে উন্নত জগতের সেই পবিত্র যুগল তীর্থ যার অমৃতধারা মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একে নিপীড়িত লুন্ঠন করাই প্রত্যেক পুরুষের ধর্ম, আমি কি একনজর দেখতেও পারব না? এতকাল ধরে শূন্য ছিলাম এই আশ্চর্য!

কাপড়ে টান লাগতেই ছবির চোখের পাতা খুলে গেল এবং আমাকে দেখতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল।

ছি!ছি! জাহেদ ভাই তোমাকে আমি অন্যরকম, কিন্তু ওর কথা শেষ হতে দিলাম না, বুকের কাছে টেনে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলাম।

ছবি কিছুক্ষণ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু অসমর্থ হয়ে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিল।

তোমার কোনো ক্ষতি করব না, লক্ষী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ভালোবাসা! অশ্রুনিরুদ্ধ জ্বালাময় কণ্ঠে ছবি বলল, এরই নাম ভালোবাসা! এ তো চুরি, ডাকাতি! ছাড় দাদা এক্ষুণি ফিরতে পারে।

ও আবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলে আমি বললাম, আর একটু থাক! তুমি জাননা ছবি আমার জীবন সার্থক হল! এরপর যদি মরেও যাই কোনো ক্ষোভ থাকবে না। আমি এখন পূর্ণ, আমি সুখী। সুখ পেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু এইটুকু সুখ নিয়েই চিরকাল বাঁচতে পারি!

ভেতরটা সত্যি প্লাবিত হয়ে গেছে শরবনে নিশুতি রাত্রির নিঃশব্দ জোয়ারের মতো। আলতোভাবে ওকে ছেড়ে দিলাম।

ছবি তৎক্ষণাৎ উঠে গেল না। সে কাঁদছে। দুই গাল বেয়ে দরদর্ গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। ওর চুলে হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললাম, এত কাঁদছ কেন তুমি? আমি অপরাধী; কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর এর ওপর আমার কোন হাত ছিল না!

ও তেমনি নিমগ্ন তেমনি নতমুখ।

ছি! আর কেঁদো না লক্ষ্মী! তুমি যা বলবে এখন আমি তাই মেনে নেবো!

ছবি ঝট্ করে ফিরে চাইল! বলল, তুমি আর এসো না এখানে, কখনো এসো না!

কথাটা শেষ করা মাত্র উঠে দাঁড়িয়ে সে চলে যাচ্ছিল, আমি ডাকলাম, ছবি! ছবি!

না! না! না!

উঠে গিয়ে দেখি ছোট রান্নঘরটার মেঝেতে বসে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে সে কাঁদছে।

পেছনে-পেছনে ওর কাছে গিয়ে আমি বললাম, ছি ছি ছবি! এমন করো না।

তুমি আর এখানে এসো না জাহেদ-ভাই, সত্যি বলছি আর এখানে এসো না!

আমার ব্যবহার ওর কান্নার উৎসকে এমনভাবে নাড়া দেবে তা ভাবতে পারি নি। কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যাই। ওর মনে কি এমন দুঃখ যে ক্রোধের বদলে রোদনই হল আত্মরক্ষার অস্ত্র? আমি তো এমন কিছু চাইনি যা দেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব? অবশ্য বিয়ের ব্যাপারে একেকজন মেয়ের এক-একটি আদর্শবোধ থাকে এবং পাত্র হিশেবে আমি নিকৃষ্ট তা স্বীকার করি। কিন্তু সে যে আমার সঙ্গে কোনরকম সর্ম্পক গড়ে তুলতে নারাজ, তাতো অন্যভাবেও প্রকাশ করতে পারত?

সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা বৃথা। যে কোনো কারণেই হোক, অশ্রুর বাঁধ যখন একবার ভেঙেছে, তখন সমস্ত বেদনার ভার কমিয়ে না দিয়ে শান্ত হবে না।

স্টুডিওতে ফিরে এলাম। কয়েকটি ছবির কল্পনা বিজলি চমকানোর মতো একসঙ্গে মাথায় খেলে গেল। শায়িতা রমণী, ক্রন্দসী যৌবন, বিষের পেয়ালা হাতে একটি তরুণী। অপেক্ষার সময় নেই। ইজেলে ক্যানভাস চাপিয়ে দিয়ে রঙের প্যালেট ও তুলি টেনে নিলাম। শায়িতা রমণী ছবিটাই প্রথম আঁকব। ডান হাঁটুটা ত্রিভুজের মতো উঁচিয়ে রাখা কপালের উপর উপুড়-করা বাঁ হাতখানা, চিত হয়ে শুয়ে আছে। পটভূমিতে আবছা- মতো একটি শিউলিগাছের ডালপালা, ফুলের সম্ভার।

কতক্ষণ কাজ করেছি খেয়াল ছিল না, জামিলের কণ্ঠস্বরে ফিরে চাই! উনি ঘরে ঢুকতে বললেন, এই যে তুমি এখানে! ছবি আঁকছ নাকি?

হ্যাঁ, চেষ্টা করছি। তার মুখের রেখাগুলো পাঠ করতে করতে বললাম, কোথায় গিয়েছিলেন?

কত জায়গায় যেতে হয় সে কথা বলে লাভ কি? ইজেলটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কম্পোজিশনটা দেখতে দেখতে জামিল বললেন, কিন্তু ভাই আজ মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

কেন কি ব্যাপার জানি না, আমার মুখটা হয়তো নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাহলে ছবি কি সব বলে দিয়েছে? কিন্ত ওর কথার ধরনে তো তা মনে হয় না?

জানো তো ছবির খাতিরেই আমি বেঁচে আছি, এতো দুঃখ কষ্টের মধ্যেও নেতিয়ে পড়ি না। কিন্ত ওকে মনমরা দেখলে ঝুপ্ করে একেবারে নৈরাশ্যের খাদে পড়ে যাই।

কেন কি হয়েছে! আমার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের ভাব। তুলিটা তুলে চেয়ে থাকি তার দিকে।

কি হয়েছে বলা মুশকিল। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম দেব ন জানন্তি। কোনদিন কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে কাঁদবে। আজকেও তার সেই রোগ উঠেছে। আর এজন্যই তো- জামিল হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে যেন চুপ হয়ে গেলো। আমি বললাম, কি বলুন না?

না। দরকার নেই। ছবির স্কেচটার ওপর দিয়ে চোখদুটো ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, বেশ হয়েছে তো। সুন্দর হবে! কি আঁকছ?

বললাম, শায়িতা রমণী।

নামটাও সুন্দর! হঠাৎ জামিল বলে উঠলেন, ও হ্যাঁ, আজকে কিন্তু না খেয়ে যেতে পারবে না। ইলিশ মাছ এনেছি। সর্ষে ইলিশ চমৎকার রান্না করে ছবি খেলে ভুলতে পারবে না। অবিশ্যি আজকে মন খারাপ ওর!

আমি বললাম, কি দরকার খাওয়ার। প্রত্যেকদিন এমন জুলুম করতে ভালো লাগছে না!

জুলুম আবার কি হে? আমি যেমন তুমি তেমন। একবাড়ির লোক বৈ তো নয় অবিশ্যি মেসে তোমাদের খাওয়ায় ভালো।

না, তা নয়। আমি সেদিক থেকে কথাটা বলছিনা। এখনকার পান্তাও আমার ভালো লাগে বিশেষত ছবির রান্না সত্যি চমৎকার!

হ্যাঁ এইবার পথে এসো। খেয়ে যাবে কিন্তু আমি একটু রান্নাঘর থেকে আসছি!

জামিল বেরিয়ে গেলো। তার সঙ্গে কথা বললেও সারাক্ষণ একই আলোড়ন আমার মনে জেগে ছিল, আমি সত্যি ছোটলোক এবং লম্পট, নইলে নিজের দুর্বলতার জন্যে তার এমন জায়গায় আঘাত করতে পারতাম না।

কিন্তু আমি কতটুকু দোষী সেটাও তো অস্পষ্ট? প্রেমে শুরু প্রেমে স্থিতি ও প্রেমেই বিলয়, আমার যখন এই ধারণা তখন কেউ এরকানা কড়ির মূল্য স্বীকার করতে না চাইলে তার দায়িত্ব আমি কি করে নেব? সামান্য স্পর্শ সে তো কিছু নয়। প্রেমের আগুনে নিঃশেষ, নিজেকে আহুতি দেয়াই তো চিরন্তন রীতি? সব দিতে হবে, সব। বলতে হবে তা'কে, আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি। আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী!

হায় রাধার মত মেয়েরা ভালবাসতে জানে না আর! একজনই জন্মেছিল আর জন্মাবে না কোনদিন! ক্লিওপট্রা লুপ্তস্মৃতি, লায়লী শিঁরী উপাখ্যানমাত্র। নারী আসলে রক্ষিতা, প্রকৃতির রক্ষিতা ; তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সন্তান-উৎপাদন করবে বলে, এর বাইরে ভুলেও এক পা বাড়াতে চায় না।

ছবি আঁকায় মগ্ন কিন্তু মনের হদিস মিলছিল না বলে নীল আকাশে হেমন্তের লঘুমেঘের মতো ধীরে ক্ষোভ জমে উঠল। তুলি রেখে দিই, ইজেলটা গুটিয়ে ফেলি রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। অগোছালো বেশ ছবি কাঠের চামচেটা ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির ভেতরে দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়ছিল। আমার উপস্থিতি ওর গোচরে এল না। একটু উচ্চেঃস্বরেই জিজ্ঞেস করলাম, দাদা কোথায় গেলেন ছবি?

আচমকা ফিরে চাইল সে। বলল, বাইরে।

কান্নার রেখায় ম্লান ওর স্নিগ্ধ মুখখানা, কিন্তু তবু সুন্দর। আমি বললাম, আমি আসি এখন ছবি, দাদাকে বলো।

খেয়ে যেতে বলেছে, ফিরে এসে না দেখলে রাগ করবেন।

তুমি বলো একটা জরুরী কাজ ছিল তাই চলে গেলাম। কথাটা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল; কিন্তু আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে বাইরে বেরিয়ে এলাম ছবি বুঝুক আমারও খানিকটা তেজ আছে।

জেদ জিনিশটা ভালো নয় শুনতাম! এবং সেজন্যেই তাকে ভালো করে ধরলাম। এদেশে ভালো হওয়ার সব পথই বন্ধ কিন্তু খারাপ হওয়ার জন্য রাস্তার অভাব নেই। এতদিন সে রাস্তা মাড়াইনি। মনে হয়েছে অর্থহীন, অনাবশ্যক। কিন্তু অন্ধকার মেসের ছোট্ট চৌকিটার ওপর শুয়ে আজকে ভাবি, শিল্পী হতে চাইলে শুধু স্বর্গ নয় নরককেও দেখা দরকার।

স্যাঁৎসেঁতে একটা বড় রুমের চারধারে চারটি চৌকি আমরা চারজন থাকি। একজন ডাক্তার একজন সাংবাদিক এবং মুজতবা আর আমি চিত্রী। চারজনই শিক্ষানবীশ; কিন্তু সেই শিক্ষা যে কোন, লাইনে গড়াচ্ছে সেটাই বিবেচ্য। ডাক্তার করিম এক নার্সের পেছনে লেগে আছে, সাংবাদিক আবার কবিতাও লেখে বিশেষ করে বাচ্চাদের ছড়া সেই সূত্রে একটি নাচিয়ে বালিকার সাথে পরিচয় আর তারই তাপে সে দগ্ধ নিয়ত। এবং মুজতবা তো একাই এক শো। কোথায় যায় কোথায় খায় সেই জানে। রাত একটা-দুটোর আগে কদাচিৎ ফিরে আসে।

একটা জিনিশ শুধু জানি ওর স্পেশাল ন্যড আঁকতে সে পারদর্শী। ওর মতে দেহ বিশেষ করে নারীদেহই হচ্ছে সবকিছুর গোড়া, সৃষ্টির নাড়িনক্ষত্র জানতে চাইলেও এখন থেকেই শুরু করতে হবে। ডাক্তার আর চিত্রী তো এক মুহূর্তের জন্যেও তা বাদ দিতে পারেন না।

ওর বড় বেতের বাক্সটা এমনি সব উলঙ্গ ছবিতে ভর্তি। তালা বন্ধ করে রাখে। বন্ধু-বান্ধব চাইলেও দেখায় না। কারণ এগুলি হজম করা যার তার পক্ষে সম্ভব নয়।

শিল্পী মাত্রই অহঙ্কারী এবং আত্মপ্রচারে উৎসাহী। দ্বিতীয়টা সম্বন্ধে মুজতবা আপাত উদাসীন হলেও তার মধ্যে প্রথমটার উচ্চতা এত বেশি যে প্রথম পরিচয়ের ক্ষণে রীতিমত ধাক্কা খেয়ে ফিরতে হয়; নিজের চারপাশে সর্বদাই সে একটি দুর্ভেদ্য রহস্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে রাখে এবং এখানেই যেন তার আত্মতৃপ্তি। কোথায় কাজ করতে যায় বহুবার জিজ্ঞেস করেছি কিন্ত জবাবে মিলেছে ভ্রুকুঞ্চন। এসব জানা সত্ত্বেও একবার অনুরোধ করেছিলাম, আমাকে নিয়ে যাও না ভাই তোমার সঙ্গে একদিন কাজ করে দেখি!

সিগারেটের টুকুরোটা ওর নিজস্ব কায়দায় আঙুল ছটকে জানালার বাইরে ছুঁড়ে বলেছিল, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর কেন। এমনিতেই তো ভালো আছিস্!

বন্ধুদের কোনো মর্যাদা তুমি দিলে না সেজন্য আমি সত্যই দুঃখিত!

একটা কথা বলি জাহেদ রাগ করিসনে। শিল্পীদের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব হয় না, এ আমি বিশ্বাস করি। একজন শিল্পী যখন অন্য একজনের কাজকে প্রশংসা করে তখন বুঝতে হবে সে মনের কথাটি বলছে না। এ নিছক প্রতারণা।

হতে পারে। আমি বললাম, তবু সবক্ষেত্রে একই সূত্র দিয়ে সবকিছুকে বাতিল করা বোধ হয় ঠিক নয়।

এখানে ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়েনি। আমরা পরস্পর কুৎসা রটনাতেই এত ব্যস্ত যে এমন কি ছবি আঁকবার সময় পাচ্ছিনে। ছাত্র আছ এখনও ঠিক বুঝতে পারছ না। বেরিয়ে এসো দেখবে সব পরিষ্কার । সে জন্য যার যার কাজ করে যাওয়াই সঠিক পন্থা। আমি শিল্পী হিসেবে পরিচিত হতে চাই এবং নামও কিনতে চাই; কিন্তু তার জন্য জয়নুলের কাজকে খাটো করে দেখবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। আমাদের চিত্রশিল্পের ভিত্তি গড়েছেন তিনি, তার কাকের পাখা থেকেই পরবর্তী উত্তরাধিকারের জন্ম এবং আগামীকাল সে বিচারে ভুল করবে না, তাকে পিতা বলেই স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু আজ? আজ তাঁর সমালোচনা করতে পারাটাই যেন কৃতিত্ব! একটু থেমে মুজতবা বলল, কিন্তু সেই অন্ধদের জানা উচিত শুধু দুর্ভিক্ষের স্কেচের জন্যেই জয়নুল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন!

আমাদের সঙ্গে কাটা কাটা কথা বলাই ওর অভ্যেস কিন্তু সেদিন কেন জানি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তাই বিস্তারিত সংলাপ।

আমি নরম হয়ে বললাম, তোমার কাজ সত্যি আমার ভালো লাগে, এবং বন্ধু হিসেবেই এখন বলছি। আমাকে একদিন তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলে কৃতজ্ঞ থাকব!

বেশ চলো একদিন! ও বলেছিল, কিন্তু ওখানে গিয়ে কাঁচুমাচু করলে চলবে না, বলে রাখছি।

ঠিক আছে। কাঁচুমাচু করব কেন। আমি একেবারেই নিরীহ প্রকৃতির, এ তোমার ভুল ধারণা!

দেখা যাবে! বলতে-মুজতবার ঠোঁটের তলে একটুখানি বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল ওর গর্ব অপরিমেয়।

এবং তা অকারণে নয় আজ ওর সঙ্গে এসে অনুভব করলাম। বেলা মাত্র আড়াইটে উজ্জ্বল দিন কিন্তু যেখানে আমাকে নিয়ে এল, সেখানে অমন দিনে দুপুরে আসাটা যথেষ্ট. সাহসের পরিচয়। ওর আত্মম্ভরিতার মতোই বলে উঠলাম, এখানে তুমি আস!

কেন খুব খারাপ জায়গা নাকি? রসিকতা করে মুজতবা বলল, পতিতালয় প্রতিভার আঁতুড়ঘর এটাই জানিসনে কি ছবি আঁকবি!

দুপুরেও লোকজনের আনাগোনা কম নয়। এক জায়গায় বাইরেই দুজন বালার সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করছে কয়জন। আমরা বড় গলিটা পেরিয়ে এলাম। দুই দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে যাওয়া ছোট্টপথে আরেকটা মোড়ে আসতেই দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে হাসছে দাঁতে মিশি, ঠোঁটে পানের রং মুখে পাউডার আধভেজা চুলগুলো কোমর অবধি ছেড়ে দেওয়া। দেখতে বেশ পারঙ্গমা। কিন্তু হাসিটাই মারাত্নক শান দেওয়া

ছুরি নয়। ধারালো তুর্কি চাকুর মতো, বসিয়ে দেওয়া মানে খতম। নারীর এ রূপ আমার অকল্পনীয় ছিল। মনে মনে প্রমাদ গুণি। ঘরে ঢোকার পর দাঁড়িয়ে থেকেই মুজতবা বলল, আমার বন্ধু জাহেদ, ভালো আর্টিস্ট। আর ইনি রাধারাণী!

পথের আলোক থেকে ঘরের আড়ালে এসে বাঁচালাম আমি, কিন্তু তবু চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। রাধা বিশ্রী ভঙ্গিতে আমার মাথার চুলগুলো হাতে নাড়া দিয়ে বলল, নাগর! এই বুঝি প্রথম আসা হল! খুব লজ্জা হচ্ছে, না?

মুজতবা চৌকির ধারে বসে পড়ে হাসছিল। সে বলল, আস্তে সখি। ওভার ডোজে বিপদ হতে পারে।

রাধা তৎক্ষণাৎ গিয়ে কোলে উঠল ওর, দুই হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরবার পর গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, কালকে আসনি কেন? আমার খুব রাগ হয়েছিল!

মুজতবা দুই হাতের তালুতে ওর গালদুটো চেপে ধরে বলল, মাঝে মাঝে ফাঁক দেওয়াই তো ভালো। টানটা বজায় থাকে!

না সে আমার ভালো লাগে না; রাধা আহলাদীর মতো বলল, আমি সব সময় চাই! তুমি যদি নিয়ে যাও আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব।

সর্বনাশ আমার জানটা থাকবে তখন?

কেন থাকবে না? কারও সাধ্যি নেই তোমার গায়ে হাত তোলে।

না। সে হয় না, রাধা! এমনিতেই ভালো আছি! তোমার বাবু হতে পারাটাই তো যথেষ্ট।

ওর গলায় ঝুলতে ঝুলতে রাধা কথাগুলো শোনে, এরপর অভিমান ভরে একটা ঠমক মেরে ছেড়ে দিল। আমি বসে ছিলাম। ক্ষিপ্রগতিতে এসে তেমনিভাবে আমাকে জড়িয়ে বলল, আমার নতুন নাগর! এস তোমার লজ্জা ভাঙিয়ে দিই।

মুজতবা এতটা নীচে নেমে গেছে এই জিনিশটা ভাববারও ফরসুৎ ছিল না প্রতি মুহূর্তে একটার পর একটা চরম আঘাত। আমার এতদিনকার ধ্যান-ধারণার স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙে পড়তে থাকে। তবে কি সমাজ সংস্কৃতি রুচি নৈতিকতা সবই মিথ্যে ? পরলোক পাগলের প্রলাপ, ধর্ম বলতে কিছু নেই, পাপ পুণ্য বাজে উপাখ্যান?

তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ রাধারাণী। একটা সিগারেট ধরিয়ে মুজতবা বলল, প্রথম দিনেই—

আমার গলা জড়িয়ে রাধা ওকে ধমকে মেরে উঠল,চুপ। কথাটি বলো না কাপুরুষ। নতুন নাগর আমার অনেক ভালো।

মুজতবা কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠল, রাধা আমার রাগ করেছে। সুহাসিনি বিনোদিনী (এবে) বদন জুড়ে মেঘ ভরেছে । রাগ করেছে রাগ করেছে, রাধা আমার রাগ করেছে ।

কিন্তু বিনোদিনী তার নতুন অতিথিকে যেভাবে জড়িয়ে সোহাগ করতে থাকে তাতে রাগের চেয়ে অনুরাগের পরিচয়টাই ছিল বেশি। এবং তার উত্তাপে নাগরটি উষ্ণ

হয়ে উঠল বটে কিন্তু খুব যে আরাম বোধ করেছে এমন নয় বরং পরিস্থিতির আকস্মিকতায় কতকটা অপ্রস্তুত হয়ে মুষড়ে পড়েছে। তার শ্বাসরোধ হওয়ার যোগাড়। শরীরে শক্তি কম নেই, ইচ্ছে করলে ঝটকা মেরে ফেলে দিতে পারত। কিন্তু শত হলেও নারী কোমল পদার্থ, গায়ের জোরে তার বাঁধন কেটে সব সময় মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন আমার কপালে বিরক্তির রেখা। মাথার চুলগুলোতে আঙুল চালিয়ে ঠিক করতে করতে বললাম, যা দেখালে একদম খাসা! এটা তোমারই উপযুক্ত জায়গা, মুজতবা। আমি চললাম।

মুজতবা দাঁত বার করে হাসছিল, বলল, এজন্যই তোকে আমি আনতে চাইনি। এতক্ষণে বুঝলি?

হ্যাঁ বুঝলাম বৈকি! ভালো মতোই বুঝলাম!

হঠাৎ রাধা আমার গলাটা দুহাতে জড়াবার পর সামনা-সামনি দেহটা চেপে মুখের কাছে মুখ তুলে বলল, আমাকে ভালো লাগছে না নাগর? কি চাও তুমি বলো ? নাচ গান অন্য কিছু?

না না কিছু লাগবে না। তোমার কাছে কিছুই আমার চাওয়ার নেই।

মুজতবা তেমনিভাবে হাসতে হাসতে বলল, রাধা তুমি বড্ড বেরসিক। তোমার কাছে প্রথম অভিসার মিষ্টি খাওয়ালে না, নতুন নাগর কি করে থাকবে বলো! এই নাও মিষ্টি ও কিছু মালপানি আনাও। আজকে সহজে যাচ্ছিনে!

দশ টাকার একটা নোট সে বাড়িয়ে দিলে। আমি কট্‌মট্ করে তাকাই। এবং পরক্ষণে বেরিয়ে আসতে চাইলে মুজতবা খপ্ করে ধরে ফেলে আমার হাতটা, বলল, যাচ্ছ কোথায় বন্ধু। মডেলের ওপর কাজ না করেই চলে যাবে? সে হবে না, বসো!

তুমি এতবড় ছোটলোক তা জানলে নিশ্চয়ই আসতাম না! আমার কথাটা শুনে মুজতবা প্রচণ্ড হা হা শব্দে হেসে উঠল। এরপর পিঠ চাপড়ে বলল, ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ!

চার

সঙ্গীর মন্তব্য যথার্থ কিনা জানিনা। তবে ওর মতো তুখোড় যে এখনো হতে পারিনি তাতো ঠিকই। এক চুমুক দুই চুমুক করে অনেকক্ষণ ধরে চা খাওয়ার সময় নিজেকে সামলে নিই। এখানে বিচলিত বোধ করার কোন কারণ নেই, সার্থকতাও নেই। মওকা যখন মিলেছে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

আঁকার সমস্ত সরঞ্জাম ঘরেই রাখা ছিল, আমরা দু'জনে তৈরি হলে রাধা আস্তে আস্তে কাপড় ছেড়ে দেয়। অঙ্গের অলঙ্কারগুলোও খুলে রাখল। আমাদের সম্মুখে এখন সে নিরাভরণা, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বহু পীড়নে শরীরটা কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়ে পড়েছে, কিন্তু গড়নটা অটুট এবং সুন্দর। চট্ করে ভেনাসের কথা মনে আসায় আমি কাছে গিয়ে ওকে সেই ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে এলাম। মন্দ লাগছে না।

মুজতবা প্যালেটটা রেখে বসে পড়ে বলল, তুইই আঁক্।

কেন, তুমি আঁকবে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কমপোজিশনটা ভালো হয়নি?

গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে মুজতবা বলল, তা হয়েছে। কিন্তু আমি দাঁড়ানো ভঙ্গিতে বহু এঁকেছি কিনা। তুই আঁক্ আমি দেখি!

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে থাকার পর রাধা হঠাৎ হাল ছেড়ে দিল। হাত-পা নাড়া দিয়ে বলল, উঁহু, রক্ত জমে যাচ্ছে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় নাকি?

তিন ঘন্টা তো অন্তত থাকতে হবে। আমি বললাম, তুমি তো এ ব্যাপারে অভ্যস্ত!

তা বটে। রাধা একটা ভেংচি কেটে বলল, কিন্তু নাগর, সে অভ্যাস তোমার কাছে অচল হয়ে পড়েছে।

মুজতবা অবিরাম হাসতে থাকে, হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ। নেশার ঝোঁকে মাথা দুলিয়ে বলল, উই ডোন্ট নো মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড শী রিকোয়ার্স সামথিং। হিয়ারর্স দি থিং ডারলিং।

ও ঢেকুর তুলতে সস্তা দিশি মদের ভোটকা গন্ধে বাতাস ভরে যাচ্ছিল। তা না হয় সহ্য করেই নিতাম; কিন্তু ওর দিকে মদের গেলাস দিতে গেলে বাধা দিই। এখন ওর মদ খাওয়া মানে গোটা পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাওয়া। আমার মনোভাবটা বুঝতে পেরে মুজতবা বলল, ড্যাম ইট্। ইউ নো নাথিং মাই ফ্রেণ্ড। দু'এক গেলাস মদে ওর কিছুছুই হবেনা। এই নাও!

রাধা গেলাসটা নিয়ে এক চুমুকে সবটুকু সাবাড় করে ফেলল!

হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! দেখলে? একদম মরুভূমি, সবটুকু শুষে নিল। আরো দাও! কুচ পরোয়া নেই। সব হারিয়ে যাবে একদম বেমালুম! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মুজতবা মাতাল হয়ে যাচ্ছে। আমি রাধাকে শুধাই, ঠিক আছ তো? কাজ চলবে?

নিশ্চয়, লাগাও। কিন্তুই একবারে আধঘন্টার বেশি রেখোনা। আধঘন্টা পর একটু বিশ্রাম নিয়ে পরে আবার দাঁড়াব। কেমন?

রাধার কণ্ঠে চপলা বালিকার আব্দারের সুর। আমি হেসে বলি, ঠিক আছে আগের মতো দাঁড়াও!

রাধা স্থির হয়ে দাঁড়ালো, ক্যানভাসের ওপরে চঞ্চল হয়ে ফেরে আমার হাতের তুলি। আমার সম্মুখে উন্মোচিত, বিকশিত নারীদেহ, চোখের দৃষ্টিকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিতে না পারলেও মগজের কোষে শিরশির করে রক্ত চলেছে।

এ ছবি ব্যর্থ হতে বাধ্য । কারণ জীবনের যে সত্যকেই রূপ দিতে চাইনা কেন, এতো পোর্ট্রেট মাত্র? এবং পোর্ট্রেট ঠিক অন্য ছবির মতো নয়। অন্য যে-কোনো ধরনের ছবি আঁকবার সময় একাকিত্ব একেবারে অপরিহার্য না হলেও, আত্মমগ্নতা বজায় থাকে সর্বদাই; তাই সেই ছবি প্রদর্শনীতে গিয়েই হয় নিরিখের বিষয়। কিন্তু প্রতিকৃতির বেলায় অন্য ব্যাপার। এ শুধু মডেলের হুবহু চিত্রণ নয়, যত সুন্দরভাবেই সেটা করা হোক না। আসলে প্রতিকৃতির সাফল্য যতটা না নির্ভর করে অঙ্কন দক্ষতায় তার চেয়ে অনেক বেশি অন্য একটি কারণের ওপর এবং সেটাই সারবস্তু। সেজন্য অনেক সময় আনাড়ি লোকের হাত দিয়েও এমন প্রতিকৃতি বেরিয়ে আসে যা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এবং সেই রহস্যটি হল সহানুভূতি, মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য। মডেলের আত্মার সঙ্গে শিল্পীর আত্মার গভীর সান্নিধ্য। এই সংবেদনশীলতা প্রায় নীরব সংলাপের মতো, যার মধ্য দিয়ে একদিকে মডেলের আত্মিক চেহারা এবং অন্যদিকে বাইরের জগতে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপায়িত। আর জীবনকে প্রকাশের বেলায় তো এর ওপরও নৈর্ব্যক্তিক চেতনারও দরকার।

কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুই আশা করবার নেই; বরং একে লাইফক্লাশের একটি কাজ বলাই সমীচীন।

তবু যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তাও ভেঙে গেল। মুজতবা আমার পেছনে বিবস্ত্র হয়ে টলতে টলতে গিয়ে মেয়েটিকে ধরে কোলে তুলে নিলে, একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে যায় আমার হাতের তুলি। সে নেশাজড়ানো গলায় টেনে টেনে বলল, ই-য়ার! এঁকে' যা, চুটি-য়ে এঁকে-যা । ভেনাস আঁক্-ছি-লি, এবার আঁক্ ভেনাস এ্যাণ্ড-মা-র্স! পল ভেরোনেজ দি সেকেণ্ড হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

শত হলেও আমি মানুষ এবং রক্তমাংসেই গড়া আমার শরীর, কাজেই সেখানে থাকা আর সম্ভব হল না। তুলিটা ওদের দিকে ছুঁড়ে মেরে দ্রুতপদে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, আনন্দের সত্য কোথায় নিহিত? সে কি মাংসপ্রিয়তায় অথবা কল্পনায়? নগ্নতায় একটা আদিম পবিত্রতা আছে, কিন্তু নগ্নতা যেখানে সভ্যতারই বিকৃতি সেখানে তার রূপও বিকারগ্রস্ত নয় কি? আলো আমি পছন্দ করি সন্দেহ নেই; তবে আলো-আঁধারির খেলাই আমার কাম্য। মানবীকে অর্ধেক স্বপ্ন দিয়ে না ঘিরলে সে তো মাংসেরই এক জলজ্যান্ত যন্ত্রণা? যে অজানা রাজ্য আকৈশোর পরম বিস্ময়ের মতো মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার ওপর এমন একটা আঘাত আসবে ভাবতে পারিনি। স্পষ্ট দিবালোকে এমন উলঙ্গভাবে আমি তাকে চাইনি; যখনই ভাবি আমি দেখি তাকে আলোছায়ার স্বপ্নেঘেরা, পরনে নীলাম্বরী, আমের বোলের মতো

সোঁদা গন্ধেভরা কালো এলোচুল, হাতে চুড়ির রিনিঠিনি, লাজনম্র মুখখানি, প্রতি অঙ্গের সোচ্চার পূর্ণতাই তার সৌন্দর্য। সে আসবে মৃদু পা'য়ে চুপি চুপি, সে যে শত জনমের আকাঙ্ক্ষার ধন। ধরা যায় তাকে কিন্তু তবু অধরা, আর সেজন্যই তো অন্তহীন কান্না .

তাকে আমি চিনেছি তাকে পেয়েছি খুঁজে, এরপর আর ভুল করতে পারিনা। নিজেকে নষ্টই যখন করতে চাই সেভাবে করাই ভালো। তার আগুনে দগ্ধ হওয়া পোড়া কয়লার মতো ভস্ম হয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমার গতি নেই।

মেসে ফিরে দেখি জামিলের চিঠি আমার চৌকির কাছে টেবিলে ঢাকা দেয়া।

জাহেদ, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল . আমি তোমার জন্য খাওয়ার যোগাড়যন্ত্র করলাম, আর তুমি কিনা না বলেই চলে এলে? সত্যি আমি খুব ব্যথিত হয়েছি। যাই হোক, আশা করি এ চিঠি পাওা মাত্র তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।

বেলা পড়ে এসেছিল, বিছানায় খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি। ওখানে যাওয়ার জন্য আমার অগোচরেই হয়তো মনটা চিৎকার করছিল। সুযোগ পেয়ে তাই প্রবলতর হল মাত্র। এখন কি করছে ছবি? নিশ্চয় হারিকেনের চিমনিটা দরজার কাছে বসে মুছছে, নয় সে রান্নাঘরে, ঘরে চাল ধুয়ে ভাত চড়িয়েছে। একটু আগে মাথা আঁচড়ে হাতেই অনেকক্ষণ বেণী পাকিয়েছে, বারান্দার নিচের গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে হয়তো চুলে গুঁজেছে একটা ফুল। কাজ করছে, কিন্তু আনমনা। সে কি আমার কথাই ভাবছে?

এখনও বাড়িতে ঢুকে বুঝতে পারি জামিল নেই আমার বুকের ভেতরটা দুরুদুরু করে উঠল আবার। এ কি বিপদ!

এবারে ছবি আর নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না, বহুক্ষণ বুকে মিশে রইল। এরপর দরদর করে আবার দুই চোখের পানি ছেড়ে দেয়। মৃদুস্বরে বলল, সত্যিই তুমি আমায় ভালোবাস?

হ্যাঁ, ছবি! আমি আবেগ-কম্পিত স্বরে বললাম, সে কি মুখের ভাষায় বলতে হবে? সাক্ষী এই সন্ধ্যা, সাক্ষী ঐ নীল আকাশ, তোমার মাথার রজনীগন্ধা! তোমাকে বুকে পেয়ে আমার জীবন ধন্য হল! সার্থক হল!

এমনভাবে বলো না, লক্ষীটি তাহলে আমি যে চিৎকার করে কাঁদতে চাইব! ছবি একটু থেমে বলল, কিন্তু সবসময় তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো?

সবসময় মানে? যদি অন্যজীবন হয় সে জীবনেও তোমাকেই ভালোবাসবো।

কিন্তু জান, মিলন হলে ভালোবাসা টেকে না?

সে আমি বিশ্বাস করি না। মিলন ছাড়া ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না, টিকবে কি করে। দেহে দেহে আত্নায়-আত্নায় বিন্দু-বিন্দু হয়ে মিশে যাওয়ার নামই প্রেম। প্রেম দেহেরই পরম শিখা, সেজন্য দেহের অবসান ঘটলেও শিখা দাউদাউ করে জ্বলতে

পারে তার মৃত্যু হয় না। তুমি বিশ্বাস কর লক্ষী, আমি কোনদিন তোমার অমর্যাদা করবনা।

কিন্তু আমার বড্ড ভয় লাগে!

কেন?

জানি না। মনে হয় তুমি যদি আমাকে বুঝতে না পারো?

সে হবে কেন!

তাইতো সে হবে কেন! আমি তো কিছু গোপন করবোনা তোমার কাছে কিছু গোপন করবোনা। তুমিও আমাকে বলবে তোমার কথা, সব। আমরা ঠিক থাকলে কেউ আমাদের সম্পর্ক ভাঙতে পারবে না! কেউ না!

ছবিকে হঠাৎ কেমন যেন বিকারগ্রস্ত মনে হল, নিজেকে আলতোভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে কাছেই দাঁড়াল। স্নিগ্ধ আকাশের ভেতর থেকে নিমেষে বেরিয়ে এসেছে কালো মেঘভার! আমি চেয়ে থাকি। অল্পক্ষণের জন্য ছবি কাছে এসে ধরা দিয়ে সে আবার দূরে সরে গেল। তার ঠোঁটমুখ কাঁপছে শির্‌শির্ করে, থমথমে ছায়ার শিহরণের মতো আমি শুধোলাম, এমন করছ যে! কি হয়েছে তোমার ছবি?

কই কিছু হয়নি তো? হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ও বলল, ভাবছিলাম পুরুষমাত্রই একরকম, একেবারে এক ছাঁচে গড়া!

কি রকম?

স্বার্থপর! নিজের স্বার্থটুকু আদায় করতেই সর্বদা ব্যস্ত। না দিলে অভিমান করে, নয় হুমকি দেখায় ; কিন্তু সেটাও স্বার্থ-উপায়ের ফন্দি। সরল-বিশ্বাসে যে মেয়ে সেই ফাঁদে পা দিল, সে-ই মরল। পুরুষদের কাছে প্রেম জিনিশটা অভিনয়, শিকার ধরবার টোপ-মাত্র কিন্তু মেয়েদের সেটাই জীবন।

যেন ছবি নয়, ছবির মুখ দিয়ে অনেক দূরের অচেনা কেউ কথাগুলো বলল মন্ত্রোচ্চারণের মতো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এসব কথা আমাকে বলছো কেন ছবি?

কেন বলছি বুঝতে পারছ না? তুমিও এইরকম বলে। তুমি শিল্পী, তুমি স্রষ্টা, একটু ভিন্ন হতে পারলে না? বন্ধুর বেশে এসে সেই বন্ধুত্বের মর্যাদা নষ্ট করতে এতটুকু তোমার দ্বিধা হল না? যা ভেবেছিলাম আসলে তা নয়। কিন্তু সাদাসিধে মেয়েটির ভিতরে এমন আগুন লুকিয়ে আছে তা ওর মুখ দেখে অনুমান করাও সম্ভব ছিল না; ওর তিরস্কারে তাই মাথা নীচু করে থাকি। সে বলল, যাক্ গে! আবারো বলছি ভালোবেসে যদি করে থাক তাহলে আমাকে তুমি ছাড়ো। তোমার মঙ্গল হবে।

সে মঙ্গল আমি চাই না ছবি! তুমি বিশ্বাস কর তোমাকে না পেলে জীবন আমার দুঃখময় হবে।

ছবির মুখের মধ্যে আবার সেই পরিচিত রেখাগুলো ফুটে উঠতে থাকে যা করে তাকে স্নিগ্ধ, মায়াময়ী।

ও পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে আমি তাকে আগলে ধরে বললাম, বল তুমি আমার হবে।

হ্যাঁ হব। আমি তোমারই হব! ঠোটের ফাঁকে ফিস্‌ফিস্ করে ছবি বলল, কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।

কি কথা বলো। মানুষের অসাধ্য না হলে আমি তা রাখব।

অসাধ্য কিছু নয়। ছবি হঠাৎ অদ্ভুত কাণ্ড করল, মাটিতে লেপটে বসার পর আমার মাথাটা বুকে নিয়ে চুলে আদর করতে করতে বলল, কথা দাও বিয়ের আগে তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না?

গম্ভীর আনন্দমগ্ন স্বরে আমি বললাম, তা কি করে সম্ভব, লক্ষ্মী!

সম্ভব খুবই সম্ভব। দেখা হবে কথা হবে কিন্তু ওটি নয় কেমন?

খানিকক্ষণ চুপ হয়ে রইলাম। ও জানেনা ওর সান্নিধ্যে এসে আমার মধ্যে কি বিপ্লব ঘটে গেছে এবং তা বাদ দেয়া আমার পক্ষে কত কষ্টকর। তবু বললাম, তুমি যদি চাও তাহলে আর আপত্তি করব না। কেমন, হলো তো?

রাত আটটার দিকে বাসায় ফিরে জামিল দেখেন স্টুডিওতে আমি কাজ করছি। কাউকে বলিনি তবে মনে-মনে আছে ছবিটার নাম হবে সোনালী শস্যের ক্ষেতে পল্লীবালা পটভূমি পরে আঁকব। এখন ছবিকে টুলে বসিয়ে চরিত্রটা শুধু ফুটিয়ে তুলছি। ছবি সত্যি আশ্চর্য মেয়ে, দেড়ঘন্টা ধরে সিটিং দিচ্ছে একটানা, তবু একটু নড়তেও চাইল না! যেভাবে হাসতে বলেছি সেই মধুর হাসিটুকু লেগেই আছে সারাক্ষণ। দ্বিতীয় মোনালিসা আঁকাই যেন আমার উদ্দেশ্য, কাজ করতে গিয়ে এমন প্রেরণা আর কোনদিন অনুভব করিনি। আমি তন্ময়, এক মোহনায় নদ ও নদীর মতো দুজনে মিশে গেছি একই আবেগের এলাকায়, ছবি [illegible]ক না হয়ে যায় না।

জামিল চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করার পর ঘরে ঢুকে বললেন, কি হে, আজ দেখি তোমার তুলি থামছেই না! কি ব্যাপার, জোয়ার এল নাকি হঠাৎ?

আমার মগ্ন চোখদুটো একবার শুধু ঘুরে আসে কিন্তু হাতের তুলি থামে না। জামিল চৌকির কোণে বসে একটা সিগারেট ধরালেন।

কমপোজিশনে হলুদ চড়ানো শেষ হলে সোজা হয়ে দাঁড়াই। হাতদুটো ওপরের দিকে ছুঁড়ে একটা গভীর শ্বাস বুক ভরে টেনে নেয়ার পর বললাম, নিশ্চয় রাগ করেননি, দাদা। জরুরী কাজ ছিল একটা তাই চলে গিয়েছিলাম!

জামিলকে আপনি বলাটা আমি কিছুতেই ছাড়তে পারলাম না। হয়তো পারবও না কোনো সময়।

ছবি বলল, আমার কাজ তো শেষ হল? এখন আমি ভাতটা চড়িয়ে দিই গে।

রোসো, এত ব্যস্ত কেন। আমি পরিবেশটাকে হালকা করবার জন্য বললাম, ছবি সত্যি কাজের মেয়ে দাদা! কি সিটিংটাই দিল, একটুখানি নড়ন-চড়ন নেই, একেবারে যেন পাথরের মূর্তি। একটা কিছু প্রেজেন্ট করলে হয় ওকে, কি বলেন?

দাদার মুখের ওপর থেকে গাম্ভীর্যের ছায়াটুকু সরে গেল না দেখে ছবি কাজের অছিলায় বেরিয়ে গেল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জামিল বললেন— দেখ জাহেদ, তোমাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করো না। জীবনকে গড়ে তোলা সত্যি কঠিন কাজ। বিশেষ করে, শিল্পীর জীবন। শিল্পীর জীবনে প্রেম দরকার, কিন্তু তাতে জড়িয়ে পড়লে চলবে না। অথচ আমরা জড়িয়ে যাই। ফলে নৈরাশ্য এবং ব্যর্থতা। দৃষ্টান্ত আমার জীবন। কিছুই করতে পারতাম না এ আমি মনে করিনে; কিন্তু একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম বলেই সখাদ সলিলে ডুবে গেছি। শিল্পী জামিলের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই, এখন আছে শুধু তার প্রেতাত্মা।

কিন্তু জামিল তো বেঁচে আছেন! আমি বললাম, এবং কাজও করছেন, তার দ্বারা মহৎ সৃষ্টি হবে না কে বলতে পারে? হয়তো সেই সৃষ্টিরই অগ্নিপরীক্ষা চলছে এখন।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইউর কমপ্লিমেন্টস্! জামিল ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, জামিলের দেহটা কবরে যায়নি এখনো একথা ঠিকই; কিন্তু সে যে মরে গেছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। এ যে গায়ের জোরে অস্বীকার করতে চাইবে বুঝব হয় সে তোয়াজ করছে নয় পরিহাস। তুমি নিশ্চয়ই সেরকম ছেলে নও? দেখ জাহেদ, আমি কাউকে গ্রহণ করি না কিন্তু যখন গ্রহণ করি আন্তরিকভাবে করি। তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি এবং আমি চাই তুমি বড় হও, হও বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী! সেইজন্য বলছি, ভুলপথে পা দিও না!

সুবোধ বালকের মতো বললাম, কথাটা ঠিক বুঝতে পারছিনা!

বুঝতে পারছ ঠিকই কিন্তু না বোঝার ভান করছ! জামিল তার প্যাকেট থেকে আমাকে একটা সিগারেট দিতে দিতে বললেন, যাই হোক, তুমি অস্বীকার করবে না কিন্তু ছবির দিকে তুমি এক পা অগ্রসর হয়েছ বলেই আমার ধারণা। তাই শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি আর সামনে বেড়ো না। এমন সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে তো কোন লাভ নেই।

আমি কি বলব হঠাৎ ঠিক করে উঠতে পারিনে। স্বীকার করলেও বিপদ, না করলেও বিপদ। কোন্ দিকে যাই?

একটুখানি ইতস্তত করে বললাম, ছবিকে বললেই ও রাজি হল। নইলে—

জাহেদ, মিছিমিছি লুকোবার চেষ্টা করো না, পাঁচ বছর একটানা প্রেম করেছি, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। চেহারা দেখলেই সব বুঝতে পারি; কার মন কোন্ দিকে ঘুরছে।

এবার আমি উত্তপ্ত হয়ে উঠি। বললাম, বেশ, যদি তাই হয়, আমি ভুল পথে পা বাড়িয়েছি বলে আমার মনে হয় না। ছবির মতো মেয়েকে ভালোবাসতে পারাটা যে-কোনো ছেলের পক্ষে সৌভাগ্য।

জামিলের চোখমুখ নিমেষে লাল হয়ে গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সটান দাঁড়িয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ তির্যক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, কিন্তু সে চলবে না। তোমাকে শিল্পী হতে হবে, শিল্পী!

আমি শিউরে উঠে একহাত পিছিয়ে যাই। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার আগেই কোমর থেকে খুলে নেয়া তার মোটা চামড়ার বেল্টের সপাং সপাং আঘাত আমার গায়ে পড়তে থাকে।

ছবি দৌড়ে এসে উচ্চারণ করল, দাদা!

বাধা দিস্‌নে ছবি; বাধা দিস্‌নে!

কিন্তু ছবি হাতসমেত ওকে সাপটে ধরল। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাড়নায় কখন বসে পড়েছিলাম জানিনে, জামিলের উন্মত্ততা শেষ হলে অন্য দৃষ্টিতে তাকাই। একি কাণ্ড!

হাতের বেল্টটা ছেড়ে জামিল কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন চৌকির ওপর ছবি ছুটে এসে আমাকে ধরে। গায়ে হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, ইস্ দাদা! তুমি একটা পশু

হ্যাঁ পশু! আমি একটা পশু! বিড়বিড় করতে করতে জামিল বাইরে চলে গেলেন।

ছবি আমাকে ধরে তোলে। সামান্য বেল্টের মার তবু লেগেছে মন্দ নয়। প্রত্যেকটা বাড়ি ফুলে ফুলে উঠেছে। আঘাতের স্থানগুলোতে চিন্‌চিন্ ব্যথা, অশেষ যন্ত্রণা ছবি আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছে বলল, তুমি কিছু মনে করো না, দাদা পাগল! সত্যি পাগল হয়ে গেছেন!

সে আমি জানি ছবি! অতিকষ্টে আমি বললাম, কিন্তু এতটা ভাবতে পারিনি!

কিছুক্ষণ এমনি ভাবেই কাটল, আঘাতের জ্বালা ভুলে একদম হতভম্ব হয়ে থাকি! এমন পরিস্থিতিও সম্ভব?

কিন্তু সেও বেশিক্ষণ নয়! ছবির হাত ধরে চৌকিতে এসে বসেই শুনি হু হু করে প্রবল কান্নার শব্দ। দু'জনে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। জামিল কাঁদছেন, বারান্দায় দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে জামিলভাই কাঁদছেন। শরীরটা ঝাঁকুনি খেয়ে ওঠে একেকবার। ছবি বাতি নিয়ে এল! আমার ভেতরটা তখনো অস্থিরতায় আচ্ছন্ন, লোকটাকে ধরতে প্রবৃত্তি হল না!

ছবি বাতিটা রেখে তার হাত ধরে বলল, দাদা! ওঠ, চল তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দিই।

জামিল দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়লেন; ছবির কাঁধে ভর করে বড় কামরার চৌকিটার ওপর গিয়ে গা এলিয়ে দিলেন। আমি হারিকেনটা নিয়ে তেপয়ার ওপরে রাখি। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে, উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। যেন চিনতে পারছেন না। ঘনঘন শ্বাস ফেলছেন। এই অবস্থা আমার অজ্ঞাত নয়। এ যে মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ছবি! মীরাবৌদির ঠিকানাটা বলো।

কেন! ও যেন ঠিক বুঝতে পারছে না।

আমি বললাম, কাজ আছে।

ছবি কম্পিত হাতে ঠিকানাটা লিখে দিতেই ওকে জামিলের মাথায় পানি ঢালতে বলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলাম। ফাঁড়ির ঘন্টায় তখন দশটা বাজছে, ঢং ঢং ঢং।

পাঁচ

শিয়রে জ্বলছে বাতি, আর জ্বলছে তিনজোড়া চোখ। ডাক্তার এনেছিলাম, তিনি পরীক্ষা করবার পর কোরামিন ইনজেকশন দিলেন এবং বললেন, অত্যধিক উত্তেজনা ও উইকনেস থেকেই এর উৎপত্তি। হার্টফেল হতেও পারত। কিন্তু এখন আর ভয় নেই. মানসিক উদ্বেগ থেকে দূরে রাখা ও ভালো পথ্য দেয়া এই দুটো জিনিশ আপনাদের দেখা দরকার!

ক্রমে সকাল হয়ে আসে। একটি দুটি করে পাখি ডাকল। রোগী তখনো ঘুমোচ্ছেন। বৌদি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বারান্দার ভাঙা রেলিংটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন পুব আকাশে উষার আভাস।শুকতারাটা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে তখনো। রাতে হাস্নাহেনার ঝাড়ে ফুল ফুটেছিল, ভোরের হাওয়ায় তারই গন্ধের রেশ এসে লাগছে।

বৌদি ঘরে এলে আমরা দু'জন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের থামিয়ে দিলেন।

আমি এখন আসি জাহেদ! বিপদ কেটে গেছে এখন তোমরাই—

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, সে হয়না বৌদি! আপনাকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছিনা!

ছবি তাকে আগলে ধরে বলল, বৌদি তুমি এমন কঠিন হয়েছ কিভাবে বুঝতে পারছি না! কেমন করে চলে যেতে চাইছ তুমি!

বৌদির মুখটা একটু কেঁপে উঠল। কণ্ঠ তুলে একটা বেদনাকে সংবরণ করতে করতে যেন বললেন, সে তুই বুঝবিনে ছবি। আমাকে যেতেই হবে।

দু'জনে যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছ। ছবি মৃদুস্বরে মিনতি জানাল, ভুলের বোঝা আর বাড়িও না, বৌদি! আমি কি তোমার কেউ নই? অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে তুমি যেয়ো না। দাদাকে কত ভালোবাসতে, কেমন করে সব ভুলে গেলে তুমি!

হ্যাঁ ভুলে গেছি, আমি সব ভুলে গেছি! মীরা বৌদি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, এবং আরো ভুলে যেতে চাই!

বৌদি আবার বারান্দার দিকে পা বাড়ালে তার শাড়ির আঁচলটা উড়ল হাওয়ায়, প্রান্তটা গিয়ে লাগল জামিলের মুখে আর তৎক্ষণাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

কে? কে ওখানে? দরজার কাছে মীরা ফিরে দাঁড়াতেই আবার জোরে উচ্চারণ করলেন জামিল, কে?

মীরা নড়তে পারছিলেন না, আমরাও কতকটা আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি. কিছুক্ষণ চেয়ে দেখার পর জামিলভাই ত্রস্তভাবে খাটের ওপর থেকে নামলেন, ছুটে গিয়ে ব্যাকুল গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলতে থাকেন, মীরা! আমার মীরা আমাকে রক্ষা কর, মীরা আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি আমাকে বাঁচাও!

মীরা-বৌদির মনের কপাটও একঝাপটায় হয়তো খুলে গেল। স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে শুধু কাঁদছেন। অনেকক্ষণ পরে মুখ না তুলেই বললেন, তুমি আমাকে শাস্তি দাও! আরো শাস্তি!

ছিঃ এমন কথা বলো না, মীরা ! ভুল দুজনেই করেছি! তিলে তিলে তার শাস্তিও পেলাম। এখন থেকে তোমার সব কথা আমি শুনবো। তোমার কোন আফসোস রাখবো না। দেখবে সত্যই আমি ভাল আঁকতে পারছি। অনেক নাম হবে। তুমি পাশে থাকবে আমার!

জামিল দরজার পাট টেনে নিলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ছবি! কোদাল আছে?

ছবি ভাবনায় যেন আচ্ছন্ন ছিল, সচেতন হয়ে বলল, হ্যাঁ ভাঙামতো আছে একটা! দেবো?

দাও! আমি বললাম, আজকের সকালটা সত্যই স্মরণীয় । তুমি স্টুডিও গুছাও গে, আমি বাড়ির জঞ্জালগুলো সাফ করি।

ওমা সে কেন! একটা ছেলেকে ডেকে চার আনা দিলেই সব পরিষ্কার করে দেবে!

আহ্ তুমি বড্ড বেরসিক! বুঝতে পারছ না কাজ করবার জন্য আমার হাতদুটো সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে নিস্‌পিস্ করছে!

ছবি আর দাঁড়াল না। কোদালটা নিয়ে এসে মিষ্টি হেসে বলল, দেখ আমার ফুলের গাছগুলোকে আবার সাফ করে ফেলোনা। অনেক কষ্ট করে বাঁচিয়ে রেখেছি। শিল্পীদের তো কোনদিকে খেয়াল থাকে না।

তাই বলে ফুলের গাছের দিকেও থাকবে না!

থাকে যদি ভালো! তবু সাবধান করে দিলাম । শিল্পীরা ফুল রচনা করে কিন্তু সত্যিকারের ফুলকে ছিঁড়ে দলা পাকাতেই ওদের আনন্দ কি না।

সে কেমন করে বুঝলে তুমি? তোমার ধারণা ভুলও তো হতে পারে?

না, ভুল নয়। এতো বড় দুজন শিল্পীর কাছে থেকে ভুল শিখব আমি? তা ছাড়া ময়রা রসগোল্লা খায়না এতো জানা কথা।

ছবি মুখ টিপে হাসলেও আমি গম্ভীর হয়ে যাই। বললাম, আমি শিল্পী কিনা জানি না, তবে ফুল আমি ভালবাসি। তোমার ফুলগাছ নষ্ট হবে না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো!

এবার ছবি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। বলল, বাব্‌বাহ! এত অল্পতেই অভিমান! বেশ তুমি আমার সব ফুলগাছ উপড়ে ফেলে দাও।

পাগল! আমি উঠানে নেমে প্যান্ট গুটিয়ে জঞ্জাল সাফ করতে লেগে যাই ছবি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, এরপর কোমরে আঁচল জড়িয়ে সেও গেল ষ্টুডিও ঘরের ভিতর।

মেঘ যখন কেটে গেছে তখন সারা পৃথিবীই আলোকিত হবে সোনালী রুপালী ধারায়। গাছের পাতারা নাচবে, গান গাইবে পাখি। নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার মনে গুঞ্জন উঠেছে একটি রাত তো ছবির আরো কাছে এলাম, এর চেয়ে বড় লাভ আর কি হতে পারে। এখনই সুযোগ। যদি কিছু করতে হয় অনেক দিনের পর এই ছোট্ট

সংসারে আনন্দধারার উৎস মুখটি যখন খুলে গেছে তখনই করা দরকার। এর মধ্যে ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে ফেলা চাই।

দরজা বন্ধ করেছেন ওরা, কখন বেরিয়ে আসবেন ঠিক নেই। তবু ভালো নাশতার আয়োজন করে ফেললাম।

পকেটে এখনো যা আছে তা দিয়ে দুপুরে পোলাও কোর্মার ব্যবস্থা করা যাবে না, ঘুষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়! ওদের দুজনের যা অবস্থা দু'একদিন না খেলেও কুচ পরোয়া নেই কিন্তু বাড়িতে লোক থাকতে একেবারেই না খাইয়ে রাখা ঠিক নয়।

সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল কেমন একটা মত্ততার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। দুপুরে গিয়ে ছেলেমেয়ে দুটোকে আনায় খাওয়াটা জমলো ভালো। ওদের কলকাকলিতে বাড়ি ঝঙ্কৃত। সন্ধ্যার আগে চায়ের টেবিলে জামিল বললেন, তুমি আমাদের এখানে এসেছ অথচ আমরাই দেখছি তোমার অতিথি!

মৃদু হেসে বললাম, সে কিছু নয়। আমি তো রোজই খাই একদিন খাওয়াতে পারব না? তাছাড়া আমার বলতে তো আলাদা কিছু নেই!

কথা বলছি বটে কিন্তু আমার চোখজোড়া গোপনে একেকবার চলে যাচ্ছে ওদের মুখের দিকে, ভাবছি এরই নাম বুঝি প্রেম! একটা বিয়ে কি সুন্দর করে তুলেছে দু জনকেই! ঠোঁটে মুখে রং ধরেছে, চোখে চাউনিতে গাঢ়তা। মীরা বৌদির চেহারায় ব্যক্তিত্বের সেই কাঠিন্য নেই বরং লাজনম্র। কথা বলছেন না। দু'একটি শব্দ বললেও বলছেন মৃদুস্বরে একের আত্মাকে অন্যে অন্তঃস্পর্শ করেছেন তাই তারা হয়েছেন পূর্ণ। চায়ে চুমুক দিতে দিতে অর্থহীন আলাপের মধ্য দিয়ে আমি ওদের অজান্তে সেই পূর্ণতার মাধুর্য পান করছি।

আমিও পূর্ণ হতে চাই আর তাই বোধ হয় এই তন্ময়তা। যে উৎসে তাঁরা পৌঁছেচেন সেখানে যেতে এখন অন্যকে কি বাধা দিতে পারেন? এ কখনো সম্ভব নয়

বৌদিকে নিশ্চয়ই সব খুলে বলেছেন জামিলভাই, নইলে আমাকে দেখলেই মুখ টিপে হাসবেন কেন? কিন্তু একদিন আমি বললে গম্ভীর হয়ে গেলেন বৌদি। বললেন, দেখ জাহেদ, শিল্পীদের আমি বিশ্বাস করিনা। এরা একেকটা পাষণ্ড এবং ছোটলোক। স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝতে চায় না। তুমি সেরকম নও তা কেমন করে বলব? তাছাড়া আমার মনে হয় শিল্পীদের বিয়ে না করাই উচিত!

চমৎকার, একেবারে খাসা! দূরত্বের শেকল থেকে এখনো মুক্ত হতে পারিনি তাই বললাম, আপনি নিজেও তো একজন শিল্পী।

একজন ভুল করেছে বলে সকলকেই তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে তার কোনো মানে নেই!

আপনাদের বিয়েটা তাহলে ভুল? আমি গুরুত্বের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

তা নয়তো কি। বিয়ে মাত্রই ভুল!

কথা বলবার সময় বৌদির ঠোঁটের কোণে এমন একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল যাকে দুষ্টুমি আখ্যা দেওয়াই সমীচীন। তাই দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। বললাম, বেশ,

ভুল যদি হয়েও থাকে তবে নিশ্চয়ই তা মহৎ এবং মধুর ভুল! এ ভুল আমিও করতে চাই।

কিন্তু জান সব জিনিশ চাইলেই পাওয়া যায় না?

তা জানি। এবং সেজন্যই তো যার কাছে গেলে পাব তাঁর কাছেই এসেছি। লক্ষ্মীর ঘরে তো কোনো অভাব নেই।

বৌদি হেসে বললেন, আমাকে তোয়াজ করে কাজ আদায় করবে ভেবেছো? কিন্তু এত সহজে আমি গলবো না।

সে নিজের চোখে দেখছি বলেই তো আরো ভরসা হচ্ছে! গুণী লোকদের এক জেদ এক কথা

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে রসালাপ করছি বটে কিন্তু মনটা পড়ে আছে অন্যদিকে । কাছে ভিতে ছবিকে দেখছি না তো? জিজ্ঞেস করলে জবাব একটা পাব তবে তাতেও থাকবে ঠাট্টার গাট্টা । কাজেই সুযোগ বুঝে চোরাচোখে এদিক-ওদিক তাকানো। সে যে এখন বাসায় নেই তা সুনিশ্চিত। নইলে অন্তত একটুখানি সাড়া মিলত। কিন্তু যাবে কোথায়? কিছুদিন থেকে একটা জিনিশ লক্ষ্য করছি যখনই আসি দেখি নোটন আর শিউলিকে নিয়েই ব্যস্ত ছবি। ভাইয়ের ছেলেমেয়েকে ভালোবাসবে নিশ্চয়ই কিন্তু এমনটা কোথাও দেখিনি। সকালে এলে দেখা যায় দুটিকে নিয়ে পড়াচ্ছে, একটুখানি চেয়ে কাঁধের ওপর আঁচলটা টেনে আবার মুখ নিচু করে বেলা দশটার আগেই ওদের গোসল করায় আর সেকি যত্নে যেন ওরা মানব- সন্তান নয় মেজে ঘষে ঝকমকে করে তোলার মতো কোন শৌখিন বস্তু! বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এলে ওদেরকে খাইয়ে দাইয়ে ওই বারান্দাটুকুর মধ্যে নানারকম খেলায় মেতে ওঠে সন্ধ্যার বাতি লাগিয়ে বলে কিসসা কাহিনী রূপকথা উপকথা আজগুবি গল্প। আমাকে যেন দেখেও দেখে না, সংক্ষিপ্ত কথাটুকুই সেরে চলে যায়। ডাকলে অবশ্যি কাছে আসে কিন্তু এইটুকুই, নিজেকে প্রকাশ করে না। সে যেন আবার গুটিয়ে গেছে এবং নিজেকে নিয়েই পরিতৃপ্ত

সিগারেট ধরাবার ভান করে রান্নাঘরে যেতে চাইলে বৌদি হেসে বললেন, ওখানে নেই ছবি!

বাহ্ রে আমি কি সে জন্য যাচ্ছি!

লুকিয়ে লাভ কি ভাই আমি সব জানি। ও পাশের বাড়িতে গেছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ডেকে দেবো?

না, না। তার দরকার নেই। আমি চেয়ারে বসে পড়ে বললাম, দাদা কোথায় গেছেন?

চাকরির খোঁজে! আমাকে নাকি কাজ করতে দেবেন না। একেবারে পাগলামি।

আমি বলি সত্যি বৌদি অফিসে আদালতে মেয়েদের কেমন বেমানান লাগে।

উলের কাঁটাদুটো থামিয়ে বৌদি বললেন, তোমার মুখে একথা শোভা পায়না, জাহেদ। তুমি শিল্পী। সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল ব্যক্তি!

যাই বলুন এ-ব্যাপারে আমি পুরোপুরি প্রাচীনই থেকে গেছি। মেয়েদেরকে গৃহলক্ষ্মী হিসেবে দেখতেই আমি ভালবাসি ।

সে অভ্যাসের দোষ।

তা হতে পারে। আমি একটু চুপ থেকে বললাম, এটা অবশ্য বুঝি মেয়েদেরকে অর্থনৈতিক মুক্তি না দিলে দেশ দাঁড়াতে পারবে না। তবু আমার গৃহিনীকে অন্য পুরুষের মাঝখানে দেখতে খারাপ লাগে।

বৌদি উচ্চহাস্য করে উঠলেন। বললেন, বাব্‌বাহ্! গৃহিনী না হতেই এমন! আর হলে তো অবস্থা কাহিল।

এমন সময় নোটনকে কোলে ও শিউলিকে হাঁটিয়ে নিয়ে পাশের বাড়ি থেকে ছবি এল। আমাকে দেখে থেমে পড়ে! বৌদি বলে উঠলেন, এই যে নন্দরানী! তোমার পাত্তাই নেই, এদিকে স্বয়ং উনি এসে বসে আছেন!

যাঃ! ছবির মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল, বলল, ক্ষেপিওনা বৌদি! তাহলে কিছছু-

হয়েছে হয়েছে। তোমাকে কিছছু করতে হবে না। একজনকে ধরে রাখতে পারলেই যথেষ্ট!

ছবি জিভ বার করে একটা ভেংচি কেটে ঘরের ভেতরে চলে গেল। বৌদি ডেকে বললেন, ছবি দিদি আমাদের চা খাওয়ানা রে! তোমার সব ব্যবস্থা করে দেব দেখিস্!

যেটুকু বা আশা ছিল তাও নষ্ট করে দিলেন।

না না। দেখো ছবি খুব ভালো মেয়ে। আমাদের চা না খাইয়ে থাকতেই পারবে না সে!

কিন্তু চা খাওয়ার জন্য বৌদিকে উঠে গিয়ে ওর কাছে নিজের মন্তব্যের জন্য ঘাট স্বীকার করতে হলো। ছবি চা করে আনে। বেতের টেবিলে ট্রের ওপরে রাখা কাপগুলোতে দু চামচ করে দুধ দিল। আমি উপস্থিত এবিষয়ে সচেতন কিন্ত ওর গাম্ভীর্যের ঠাণ্ডা দেয়ালের ভেতরে রক্তিম হৃৎপিণ্ডটা দেখতে পাচ্ছিনে। বুকের অতলে চিন্ চিন্ করে একটুখানি ব্যথা খেলা করতে থাকে, একি হল! ছবির এই পশ্চাদপসরণের অর্থ কি? আমার কোনো ব্যবহারে কি ও ক্ষুন্ন হয়েছে অথবা অন্য কোনো কারণ?

নোটন এসে কাছে দাঁড়াতেই ছবি তাড়াতাড়ি ওকে কোলে তুলে নিল। বৌদি বললেন, একদিকে আমার ভালোই হয়েছে ভাই। ছেলেমেয়ের-ঝামেলা নেই। নোটন শিউলি তো ছবির! ওর একটা গতি হয়ে গেলে সেটাই হবে বিপদ!

আবার! ছবি শাসনের দৃষ্টিতে তাকাল, বুঝতে পারছি তোমাকে আরো শিক্ষা দিতে হবে, বৌদি।

তুমি আর কি শিক্ষা দেবে। নানান রকম শিক্ষা পেয়ে এখন নিজেই আমি শিক্ষয়িত্রী।

বৌদির কথা শেষ হতেই ছবি যে দরজাটা দিয়ে ও বাড়ি থেকে এসেছিল সেটাই ঠেলে আঠার উনিশ বছরের একটি ছেলে প্রবেশ করল। লম্বা ছিপছপে গড়ন, সুদর্শন

পরনে ছাইরঙা প্যান্ট, গায়ে হাওয়াই সার্ট, চুলগুলি অবিন্যস্ত। সে আমাদের দেখেই বৌদিকে জিজ্ঞেস করল, বৌদি কেমন আছেন? ছবি আছে?

হ্যাঁ, আছে। বৌদি উৎসাহিত হয়ে বললেন, কি ব্যাপার মিন্টু, এতদিনে এলে তুমি।

বছরে একবার ছুটি পাই। গতবারও তো এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।

হ্যাঁ আমি তখন অন্যত্র ছিলাম। বৌদি টেবিলের ধারে উল ও কাঁটাগুলো রেখে বললেন, তুমি বোসো মিন্টু। ছবি দেখে যা, কে এসেছে।

ছবি ছুটে এসে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, মিন্টু। আমি গিয়েছিলাম, তুমি বাইরে ছিলে।

মিন্টু চেয়ার থেকে উঠে ওর কাছে গেল। বলল, হ্যাঁ, বাইরে একটু কাজ ছিল। আচ্ছা তুমি আমার একটা চিঠির জবাব দাওনি কেন?

ছবির মুখটা যেন দপ্ করে নিভে গেল। বলল, কই চিঠি তো আমি পাইনি?

পাওনি? একটা চিঠিও না? মিন্টু উত্তেজিত হয়ে উঠল, সে এ্যাবসার্ড, ইমপোসিবল!

বৌদি বললেন, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বোস মিন্টু। ধীরে সুস্থে কথা বলো .

না না, বৌদি। যদি তাই হয়ে থাকে আই শ্যাল সী টু ইট। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের বারোটা বাজিয়ে দেবো না?

আমার কানদুটো কেন ভোঁ ভোঁ করছিল বলতে পারব না। ম্লান পাংশু মুখে বসে আছি। আমার শিরায় এক আগুন জ্বলে উঠেছে, মনে হয় ঈর্ষার আগুন। আরো কিছুক্ষণ উল্লাসের খই ফোটানোর পর ছেলেটি চলে গেলেও অবরুদ্ধ আক্রোশের প্রাবল্যে আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। বৌদি আমার মনোভাবটা যেন বুঝলেন। তাই হালকা ভঙ্গিতে বললেন, একদম পাগল! রিসালপুর পর্যন্ত গেছে, কিন্তু পাইলট হতে পারবে বলে মনে হয় না! ছবিকে সে এখনো মনে করে সাত বছরের খুকি!

আমি খানিকটা সহজ হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটি কে?

ওই তো ও বাড়ির বোরহান সাহেবের ছেলে। ওর বোন পান্না ছবির বন্ধু!

হুঁ। কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে ফেললাম, আমাদের আদাবটা পর্যন্ত দিল না বেশ উন্নতি হবে ছোকরার!

ছবি ঘরে চলে গিয়েছিল। আমার কথায় একটু বিরস হাসি হেসে বৌদি ডাকলেন, ছবি!

ও ভেতর থেকে বলল, যাই বৌদি!

এরপর বেরিয়ে এলে বৌদি জিগ্গেস করলেন, আচ্ছা মিন্টু ছোকরা তোর কাছে চিঠি লিখেছিল নাকি?

ছবি আমার কঠিন মুখটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। তিনটে চিঠি দিয়েছিল।

কোথায় সেগুলো?

সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলেছি। ছবি পা'য়ের বুড়ো আঙুলে একটা কি টিপতে টিপতে বলল, যত সব বাজে। ছেলেটা আসলে বোকা!

সেজন্য বুঝি কিছু বলিস্ নি?

তাই!

ঠিক আছে আমিই বলে দেব' খন। বৌদি বেশ জোর দিয়েই বললেন, বুঝিয়ে দেব যে, সে খোকা হলেও ধাড়ি খোকা! না বুঝলে গার্জিয়ানদের জানাতে হবে তা, এভাবে বাসার ভেতরেইবা ঢোকা কেন?

হাতে দু'টো প্যাকেট, মিন্টু আবার ব্যস্তভাবে প্রবেশ করল। ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এল, ছবি! ছবি!

ও আড়ালে গিয়ে বসেছিল, বেরিয়ে এল না। মিন্টু কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ছবি কোথায়, বৌদি?

বৌদি অবলীলাক্রমে বললেন, কি জানি কোথায় গেল! কেন কিছু কাজ আছে তোমার?

হ্যাঁ কয়েকটা জিনিশ এনেছিলাম ওর জন্য! এই যে নাইলনের ওড়না ও একটা ব্লাউজ পীস, জরির কাজ করা ভ্যানিটি ব্যাগ একটা, মল থেকে কেনা খাঁটি লাহোরের জিনিশ। এদেশে পাওয়া যায় না!

মিছিমিছি এগুলি কেন আনতে গেলে, এসমস্ত ওর কোনো কাজে লাগবে না।

কাজে লাগবে না? কেন?

সালুয়ার কামিজ ওড়না তো পরেই না। নাইলনের ব্লাউজ পরা যায় না। ভ্যানিটি ব্যাগেরও ওর দরকার নেই! তুমি এগুলো বরং তোমার আপাকে দিয়ে দিও!

আপার জন্য তো এনেছি। মিন্টু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়েই বলল, সালুয়ার কামিজে কিন্তু ছবিকে বেশ মানাবে! মর্ডান গার্ল ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহার করবে না কেন!

বৌদি একটু উষ্ণ হয়ে বললেন, সবাই করে না মিন্টু, সবাই ব্যবহার করে না বুঝলে, তাছাড়া তোমার জিনিশ নেবেই বা কেন সে? এসব ভাবনা ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দাওগে যাও!

আমার মনটা শান্ত হয়ে এসেছিল। মিন্টু বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে আমি বললাম, দেখি কি রকম জিনিশ!

. আমাকে চেনেনা, দেখেওনি কোনদিন, অনিচ্ছার সঙ্গে দিল প্যাকেটগুলো। সেই মুহূর্তে আমি ভাবি, একে অযথা গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই; বরং সহজভাবে গ্রহণ করলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। আর ছোটবেলার বন্ধুত্বের দাবিতে বয়োসন্ধিকালে যদি কিছু বাচালতাও করে সেটা খুব বড় অপরাধ তো নয়? এক্ষেত্রে তার বেশি কিছু নেই বলেই আমার পর্যবেক্ষণ। তাই, ব্যাপারটাকে জটিলতামুক্ত করবার জন্য জিনিশগুলি খুলে ধরে

আনন্দিত-স্বরে আমি বলে উঠি, দেখুন বৌদি! সত্যই সুন্দর জিনিশ! ছবিকে বেশ মানাবে!

আমার ব্যবহারে বৌদি একটু আশ্চর্য হলেন। মিন্টু সহানুভূতি পেয়ে বলল, দেখুন না, আমি কি মিথ্যে বলেছিলাম?

না, না কিছুতেই না। আমি উচ্চকণ্ঠে ডাক দিই, ছবি! ছবি! দেখে যাও, কি সুন্দর জিনিশ এনেছে তোমার জন্য!

মিন্টুর মুখটা নিরীহ সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বলল, ছবি আছে নাকি?

আছে, ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়! আমি উঠে গিয়ে দেখি ছবি সত্যি নোটনকে কোলের কাছে রেখে চৌকির ধারে শুয়ে চোখ বুঁজে আছে। ওর হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে এলাম টেবিলটা দেখিয়ে বললাম, তোমার জন্য কি সুন্দর জিনিশ এনেছে মিন্টু, দ্যাখ!

ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল, আসলে ও সব কথা শুনেছে। তার চেহারা থেকে সম্পূর্ণ কেটে গেছে ক্লিষ্টতার মেঘ। আমার চোখে চেয়ে হাসল একটুখানি, এরপর সেগুলো হাতে নিয়ে দেখতে থাকে। বৌদির মুখেও হাসি ফুটেছে। মিন্টুর দিকে চেয়ে বলল, কিছু মনে করোনা, ভাই। এদ্দিন পরে এসেছ, তোমাকে একটু যাচাই করে নিলাম!

মিন্টু দাঁত বার করে বোকার মতো নিঃশব্দে হাসতে থাকে। বাড়ির বারান্দা থেকে দেখা- যাওয়া টুকরো নীল আকাশ জুড়ে তখন অনেক পাখির মেলা।

আকাশে পাখির মেলা, কিন্তু বর্ষাকাল মাত্র। বর্ষার পরে শরৎ, শরতের পরে হেমন্ত এবং তারও পরে বসন্ত। সে অনেক দিন প্রায় তিন যুগেরই সমান। হাতজোড় করে বললাম, একটু দয়া করুন, বৌদি। এত দেরী কেন। আগে হলে তো কোন ক্ষতি নেই।

ক্ষতি নেই! শিল্পীর বিয়ে ফালগুন মাসেই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি!

কিন্তু বৌদি, এ যুগের শিল্পী তো সে-যুগের সভাসদ নয়, সে মূলত ট্যাজেডিরই কবি। তাই বর্ষাকালটাই তার বিবাহের উপযুক্ত সময় নয় কি?

যাই বল, বর্ষাকালটা বিরহেরই কাল! বৌদি হেসে বলল, পূর্বরাগটা একটু বেশি সময়ই চলুক না! এর মধ্যে সব গুছিয়ে নাও।

হাল্কাভাবে বললেও কথাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গতিহীন পাত্রের হাতে অভিভাবক মেয়ে তুলে দেবেন না, এ স্বাভাবিক। এবং এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি বৈ কি। কপাল ভালো, ব্যবস্থা হয়েও গেছে একটা স্কুলের একজন টিচার বৃত্তি নিয়ে জাপান যাচ্ছেন দু'বছরের জন্য, তাঁর জায়গায় কাজ করব আমি ! কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। কাজটা অবশ্য অস্থায়ী, কিন্তু দু'বৎসর সময় তো নেহাৎ কম নয়? এর মধ্যে সুবিধে একটা হবে। এমনকি, স্কুলেও লেকচারারের পদ পেয়ে যেতে পারি। সিলেবাসের বিস্তৃতির পরিকল্পনা এবং সে-জন্য নতুন লোকের দরকার।

কিন্তু যার কারণে এত সাধনা, তার থেকে যে ক্রমেই দূরে সরে পড়ছি! দেখা হয়, তবু ব্যবধানটুকু বজায় থাকে। বৌদি কথা দিয়েছেন, দাদা মৌন, এখন ওর অভিমতটা জানতে পারলে মন্দ লাগত না।

সেদিন সুযোগ মিলল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল, বাসার কাছে যেতেই ঝম্‌ঝম্ বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে উঠলাম বারান্দায়। বিকেল বেলা, অথচ ছোটদের সাড়াশব্দ নেই. বড় ঘরটা ফাঁকা। ওরা বাইরে বেরিয়েছেন নিশ্চয়ই! কিন্তু বাসা খালি রেখে তো যেতে পারেন না?

স্টুডিও ঘরটাও শূন্য। জামিলভাই একটা কাজে হাত দিয়েছেন, ক্যানভাস ইজেলে স্যাটানো।

হঠাৎ শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে রান্নাঘরের দিকে যাই। একধারে পেছন ফিরে পিঁড়িতে বসে আছে ছবি। তার কোলে, মনে হল, একটি ছোট্ট ছেলে। ছোট্ট পা দু'টো ছুঁড়ে উঁআঁ উঁআঁ করছে।

পাশ ফিরে আমাকে দেখতেই ছবি লজ্জায় আরক্তিম হয়ে গেল। বলল, একি! তুমি!

হ্যাঁ, আমি। বাচ্চাদের দিকে তোমার বড় টান দেখছি!

পান্নার ছেলে! এতটুকুন, কিন্তু ভারী দুষ্টু! ছবি বলল, আচ্ছা, তুমি এলে কি করে? গেট বন্ধ ছিল না?

কই না তো?

কত যে ভুল হচ্ছে আমার! বৌদিরা বাইরে গেছেন! ছবি একটু ইতস্তত করে বলল, তুমি এখন চলে যাও না?

আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, কেন? কেন একথা বলছ?

তুমি আর আমি এ-বাড়িতে একলা, লোকে কি ভাববে! তাছাড়া আমার বড্ড ভয় করে।

ভয়! ভয় কিসের? কাঁধের ওপর শুইয়ে বাঁহাতে ও ছেলেটাকে ধরে রেখেছে, শরীরে একটু দোলা জাগিয়ে ডানহাতে মাঝে মাঝে ওর পিঠে চাপড় মারছে, আমি সেই হাতটা এনে নিয়ে আলতোভাবে ধরে আদর করতে থাকি। আপনা থেকেই আমার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল। বললাম, শুনেছ তো?

ছবি নিচু মুখটা তুলে আস্তে করে বলল, হ্যাঁ।

কিছু বললে না তুমি? কিছু শোনবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি!

কি আর বলবো! ছবি তেমনি নিচু স্নিগ্ধস্বরে বলল, বিয়ে না হলেই নয়?

আমি আকুল হয়ে উঠি। বললাম, নতুন করে একথা কেন বলছ তুমি, লক্ষ্মী! কিছুই তো তোমার অজানা নেই!

তা নেই। কিন্তু আমার বড্ড ভয় হয়, যদি তুমি বুঝ কোনদিন, আমাকে ভালবাসতে না পার-তা'হলে আমি বাঁচবো না যে!

ভবিতব্য সম্পর্কে কিছু বলা যায় না, তোমাকে আঘাত দেওয়া যে হবে আমার নিজেকেই আঘাত করা!

ওর হাত ধরে কাছে আকর্ষণ করছিলাম, ছবি মধুর শাসনের ভঙ্গিতে চাইল, বলল, হেই! কি কথা হয়েছিল মনে নেই?

আছে। আমি গভীরভাবে বললাম, তবে আর কাঁহাতক-!

আওতার দরজার কাছে মেয়েলিস্বর শুনতে পেয়ে ছবি বলল, এই ছাড় পান্না আসছে!

আচ্ছা বিপদ ,সিগারেট ধরাবার জন্যে আমি উনুনের কাছে গিয়ে বসলাম। ছবি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

যা ছেলে বাবা! বাপটা বোধ হয় চাষা! কিছুতেই বাগ মানে না!

যা বলেছিস অন্যের কোলে থাকতে চায় না! তবু তো তোর কাছে অনেকক্ষণ রইল। ইস্ কি বিশ্রী বৃষ্টি!

দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল বসি গে।

এবারে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করা যেতে পারে। সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে এলাম! ওরা স্টুডিও ঘরে বসেছিল, এমনভাবে গিয়ে উঠলাম যেন এইমাত্র এসেছি।

এই যে ছবি, দাদা কোথায়?

ওরা তো বাইরে গেছেন। পান্না ঘোমটা টেনে দাঁড়াতেই ছবি বলল, একি! এত লজ্জা পাচ্ছিস কেন? শিল্পী জাহেদ! আর এ হচ্ছে আমার বন্ধু পান্না।

ও আচ্ছা আদাব!

পান্নাও বলল, আদাব।

তাহলে আর কি করব, চলে যাই? ছবির দিকে চেয়েই বলে উঠলাম, বাঃ! চমৎকার তো!

ও খানিকটা অপ্রস্তুতের মতো উচ্চারণ করল, কী?

শিশুকোলে ওর বসার মধ্যে কুমারীমাতা ও ছেলের অপূর্ব ভঙ্গি ফুটে উঠেছিল আমি ওর কথার সরাসরি জবাব দিলাম না। ব্যস্তভাবে কাগজ, তুলি টেনে নিয়ে বললাম, এভাবেই বস একটু প্লিজ্!

পান্নার দিকে অর্থপূর্ণ সহাস্য মখে একবার চেয়ে ছবি স্থির হয়ে বসে ব্রাশ লাইনে ওয়াটারকালার করছি। যদি ভালো হয়ে যায় পরে তেলরঙে নেওয়া কঠিন হবে না। মডেলের প্রাণের রামধনু আমার মনের আকাশে সপ্তরঙের সমারোহ সৃষ্টি করেছে, কাজেই প্রতিটা রেখা একেবারে আমার আত্মার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে সূক্ষ্ম রাগিণীর মতো। ক্রমে আমি আত্মহারা হয়ে পড়ছি।

কিন্তু সব পণ্ড হয়ে গেল। ছেলেটা হঠাৎ এমন কান্না জুড়ে দিল, ওর মায়ের সক্রিয় হওয়া ছাড়া উপায় রইলো না।

যাঃ। কাজটা করতে পারলাম না।

একেবারে দস্যি ছেলে। পান্না ওকে দোলাতে দোলাতে বাইরে নিয়ে গেল

ছবি তেমনিভাবে বসেছিল, ও যেন অতলান্ত ভাবনার গভীরে ডুবে গেছে। ওর তন্ময় চোখে কিসের স্বপ্ন?

আরও একদিন আমার মনে এই প্রশ্ন জাগল। ফালগুনে যেতে হয়নি, বহু পীড়াপীড়ির ফলে শরতেই তাকে পেয়েছি, গভীর নীল আকাশের মতোই কানায় কানায় ভরে আছে আমার মন। বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, একি সত্যি?

ছবি আমার সহধর্মিনী? জীবন সঙ্গিনী শাদা কথায়, বৌ? ভাবতে অবাক লাগে ছোটবেলা থেকেই একটা কঠিন সংকল্প ছিল বড় হব। বিয়েশাদি ব্যাপারটার কথা কখনো চিন্তা করিনি। এমনকি বড় হয়েও ওসব পথের ত্রিসীমানাও মাড়াইনি। অথচ আশ্চর্য আমি প্রেমে পড়লাম এবং যাকে ভালবেসেছি তাকে বিয়েও করলাম। এযে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক।

বৌদিকে বেশ উদার মনে করেছিলাম, আসলে তা নয়। বিয়ের পর পনোরো দিন ছবিকে নিজের কাছেই রেখে দিলেন।

কিন্তু বাসাটা সম্পূর্ণ গুছানো হয়ে গেলে প্রায় জোর করেই ওকে নিয়ে এলাম। বৌদি বললেন, দেখ ভাই এত উৎসাহ ভাল নয়।

বললাম, বৌদি, আপনিও ভুলে যাবেন না, পাকা লোকেরাই পাকামি করে বেশি.

বাসাটা ছোটো। তবু আমাদের দুজনের পক্ষে খুব ভালো। দুতালা বাড়ির নিচের দুটো কামরা। লাইট কল আছে। উপরন্তু দেয়ালের বাইরে একটা বড় পুকুর, তার পাড় ঘেঁষে নারকেল গাছের সারি, আকাশের অনেকখানি-এগুলো নিঃসন্দেহে বাড়তি পাওনা। ওপর তলায় সস্ত্রীক একজন অধ্যাপক থাকেন।

একটি কামরায় আমার স্টুডিও ও বৈঠকখানা, অন্য কামরাটি শোবার। বাসাটা ছবি খুব পছন্দ করল, আমি বিশেষ খুশি হলাম সেজন্য।

অপূর্ব রাত আজ। রূপকথারই মতো। গভীর আকাশের হালকা শাদামেঘে পূর্ণিমার চাঁদ রুপোর কাঠির মায়া বুলিয়ে নিচের বসুন্ধরাকে করেছে সুন্দরী। নারকেল গাছের পাতাগুলো নড়ছে মৃদুমন্দ হাওয়ায়। পুকুরের জলে আলোর ঝিলিমিলি। আমাদের ঘরে ফুলদানিতে মরশুমি ফুল, মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগছে। অনেক বিনিদ্র আকাঙ্ক্ষার রাত পেরিয়ে আজকে এল জীবনের পরম লগ্ন।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে আছে ছবি, কী দেখছে সে? কী দেখছে? কোমল কোরকের মধ্যে পদ্মের মতো ওর নিটোল দেহখানি নিবিড় সৌরভে ঘেরা। সামান্য আভরণ, তাই বেনারসী শাড়ির আড়ালে ঝিক্‌মিক করছে।

আমিও বসে আছি বিছানার ধারে, একটা সিগারেট ফুঁকছি। পরিপূর্ণ অনুভূতির নিঃশব্দ গভীরতা এসে আমাকে পরতে পরতে ঘিরে ফেলেছে। এমনো যে হয় ত জানি না শরীরের আক্ষেপের বদলে স্থৈর্য। চাঞ্চল্যের বদলে স্তব্ধতা।

সিগারেটের শেষাংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিই জানালা দিয়ে। আস্তে আস্তে কাছে গেলাম ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে ডাকি, ছবি!

ও খানিকক্ষণ নীরব থাকে এরপর কথা না-বলার মতো করে একটি ধ্বনি উচ্চারণ করে, কি-!

দুই হাত বুকের কাছে আলগোছে জড়িয়ে ধরে বললাম, তুমি সুখী হয়েছ?

আমার মুখ ওর মুখের কাছে। সে চোখজোড়া বাইরে থেকে ফিরিয়ে এনে চাইল. আস্তে করে বলল, হ্যাঁ।

একি! তোমার চোখে পানি! দুইবিন্দু অশ্রু ওর দুই চোখের কোণে চিক্‌চিক্ করছে. আমার মাথার চুলে একটা হাত, ও বলল, তোমাকে পেয়েছি। কাঁদবো না?

এত সুখ। তবে কান্না কেন?

প্রকৃত সুখের নামই তো কান্না! ছবি এত সুন্দর করে কথা বলতে শিখেছে! আমি হাতের আঙুল দিয়ে চোখজোড়া মুছে দিই। সে বলল, প্রথম দিন প্রত্যেক মেয়েই একবার কাঁদে সে জানো? এ কান্না কান্না নয়।

আমি বললাম, সত্যি ছবি আমি আশ্চর্য হচ্ছি.তোমাকে পেয়েছি একি সত্যি অথবা স্বপ্ন?

জনমে জনমে আমি যে তোমারই ছিলাম। আমাকে পাবে সে তো নতুন কিছু নয়।

তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক। নইলে মেয়ে তো কম দেখিনি কিন্তু তোমাকে পাওয়ার জন্য পাগল হলাম কেন।

আমার চোখের পানি তুমি মুছিয়ে দিয়েছ, সারাজীবন তোমার এই আদর থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

কী যে বল তুমি!

অনেকক্ষণের জন্য আমাদের মুখে চাঁদের আলো নিভে গেল, বদলে সেখান থেকে সারাদেহে মধুর উত্তাপ শির্‌শির্‌ করে সঞ্চারিত হতে থাকে।

এরপর বিছানার দিকে নিয়ে আসতে চাইলে ছবি মিনতি করে বলল, থাক না লক্ষ্মীটি। এখানেই ভালো লাগছে।

বললাম, সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে কাটাবে?

সারারাত কোথায় মাত্র দশটা বাজলো, একটু থেমে ছবি বলল, তা নাইবা হল, একটি রাত কাটাতে পারব না?

সারারাত জেগেই তো কাটাবে। কিন্তু তাই বলে এখানে দাঁড়িয়ে নয়

কোলপাঁজা করে তুললে ছবি দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

এতদিন এসব দুষ্টুমিই বুঝি শিখেছ?

হ্যাঁ শিখেছি। এবং তা তোমারই জন্য।

একি তোমার চোখ লাল হয়ে গেছে দেখি রাখো লক্ষ্মীটি ! একটুখানি! ছবি উঠে দাঁড়িয়ে সুইচটার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি বললাম, আলো থাক্‌ না!

ছবি ওখান থেকেই প্রায় কেঁদে উঠে বলল, না, না!

সুইচটা অফ করে দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ছবি। ভেবেছিল বোধ হয়, বাতি নিভিয়ে দিলে ঘরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। বাইরে জোছনা ও জানালা খোলা থাকার দরুন আলোর আভাসটুকু আছে। ঘরটা সম্পূর্ণ মসীবর্ণ হয়ে গেলে হয়তো সে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে লুকোচুরি খেলার চেষ্টা করত। কিন্তু দেয়ালের কাছে ওর আবছা মূর্তিটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন। আমি কোমল স্বরে ডাকলাম, এসো।

ছবি কোনো কথা বললো না। কেবল ওর হাতের চুড়ির অস্পষ্ট রিনিঠিনি বোল শোনা গেল।

আমার ওঠা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সেও যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সামনা-সামনি এগুতে থাকলে একদিকে সরে গেল। বুঝলাম ওর মনে দুষ্টুমি বুদ্ধি। আমিই বা কম কিসে? চোখের পলকে ধরে ফেললাম। আর এখন যখন স্পষ্ট আলো নেই তখন সংকোচকে বিদায় দিতেও বাধা নেই।

প্রথম বাসর, ওর বাধাকে জয় করাই তো আজকে আমার কাজ।

চাঁদটা আরো একটু সরে গেছে আকাশের কোলে, গাছের পাতাগুলো লুকোচুরি খেলছে জোছনার সঙ্গে। ধীরে ধীরে একখণ্ড বেগুনীমেঘ এসে চাঁদকে গ্রাস করে ফেলে, তাই ডুবে গেল জানালা এবং ঘরের ভেতরটাও আরো একটু অন্ধকার হয়ে এল!

কিন্তু আমি তো অন্ধকার চাই না। আমি চাই আলো, আরো আলো। স্পষ্ট দিবালোকের মতো উজ্জ্বল । যে আলোতে আমার এতকালের স্বপ্নের স্বর্গ মোহন-মহিমায় উন্মোচিত হবে। বিদ্যুতের শিখা অন্তত একবার সেই স্বর্গের শিখর বেদী অলিন্দ ফোয়ারা পুষ্পবন আমার দু'নয়নে মুদ্রিত করে দিয়ে যাক্, এরপরে তাকে ছায়ার স্বপ্ন দিয়েই রচনা করব। পাব তাকে ষড়ঋতুর বিচিত্র লীলায়, আলো আঁধারিতে প্রতিদিন প্রতিরাত।

আমি উঠে যেতে চাইলে ছবি তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, না, না।

কি?

তুমি কিছুতেই আলো জ্বালাতে পারবে না!

ওর কণ্ঠস্বরের তীব্রতা বিস্মিত হওয়ার মতো। কিন্তু এখন কিছু হওয়ারই সময় নয়! ফেনিল ঢেউ আছড়ে পড়া সমুদ্রে দাঁড়িয়ে বাজে ভাবনার অবসর কোথায়?

ছবি নেতিয়ে পড়েছিল। সে শ্রান্ত, পরিপ্লুত। [illegible] গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। বলল, শোনো!

আমিও চুপচাপ শুয়েছিলাম! বললাম, কি?

শিশুর কান্না না?

ওপরতলা থেকে সেই শব্দ শোনা গেল বটে, কিন্তু আমি বললাম, কাঁদছে তা'তে কি? শিশু তো কাঁদবেই ! শুয়ে থাকো।

কিন্তু ছবি খাট থেকে নেমে নীচে দাঁড়িয়ে গোছাগাছ করতে থাকে। মৃদু রিণ্‌রিণ্ করে বাজে ওর হাতের চুড়ি। এরপর ডাকল, এই শুনছ? আমি একটু বাইরে যাই?

বাইরে কেন ? শুয়ে থাক না? অনেক রাত হয়েছে।

কোথায় অনেক রাত? বালিশের কাছে হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে রেডিয়াম কাঁটা দেখবার পর বলল, মাত্র সাড়ে এগারটা।

মেঘের পাহাড় সরে গিয়েছিল হয়তো, জানলাটা আবার আলোকিত হয়েছে। ছবি একটা শিক ধরে দাঁড়াল। পিঠে খোলা চুলের ঝাকড়া।

শিশুর কান্না থেমে গেল বলেই কিনা জানি না, ছবি আর বারান্দায় যেতে পীড়াপীড়ি করল না। সে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, প্রবল জোছনা-ধারায় হালকা শাদা মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে। ও চুপচাপ, জীবনের নতুন স্বাদই কি ওকে মূক করে দিয়েছে?

কিন্তু আমি ভাবছিলাম, শিশুর প্রতি ছবির এত টান কেন। মেয়েরা ছোটদের ভালোবাসে, তবু ওর ব্যবহারের মধ্যে একটুখানি আতিশয্য আছে নাকি? এবং সেটা শুধু নোটন-শিউলি নয়, তাদের ছাড়িয়ে বাইরের দিকেও উন্মুখ। হয় এটা এক ধরনের খ্যাপামি; নয় অস্বাভাবিক। যাই হোক্ ওর কোলে একটা শিশু আসুক, এই মুহূর্তে এই

আমার আন্তরিক কামনা। কিন্তু তা তো রাতারাতি সম্ভব নয়। আট দশটি মাস তো অন্তত দরকার। যেরকম ভাবসাব, এতদিন থাকবে কি করে? বৌদির ছেলেমেয়েদের কথা দু'একদিন পরে নিশ্চয় বলবে ও।

একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে গেলাম। ওর কাছে গিয়ে কানে কানে বলি, ছেলে তোমার চাই একটা, না?

ছবি কি ভাবছিল, চোখ তুলে চাইল আমার মুখের দিকে, অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করল, তা কি আমি বলেছি!

সব কথা বলতে হয় না ছবি। আমি বললাম, তা'ছাড়া প্রথমে দু'একটার দরকার তো বটেই। পরে না-হয় অন্য কিছু ভাবা যাবে।

জানালার একটি কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ছবি। আমার বুকে ওর মাথাটা আস্তে করে এলিয়ে দিল। এ যেন নীরব সম্মতি।

রাত ক্রমে বেড়ে চলে। ঝিমিয়ে আসে গাছপালা, সারা প্রকৃতি। রূপালী চাঁদ নিস্তব্ধ পৃথিবীতে তার মায়া বিছিয়ে হাসে। ছবি এসে শুয়েছিল, এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে ঘুমোতে চায়নি, তাই এ-ঘুম যেন ওর নিজের নয়। আকাঙ্ক্ষার আবেশ বেয়ে যে সফলতা এল, তারই সোনার কাঠির স্পর্শে যেন সে সুপ্তির অন্তরঙ্গ প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

ফিনফিনে জালের নতুন মশারিটা নড়ছে একটু-একটু, আমার চোখে ঘুম নেই। বাজে চিন্তার সূত্রটা কিছুতেই ছিন্ন করতে পারছিনে। বরং সে ফেনিয়ে ওঠে এই রাত তো আর আসবে না কোনদিন ফিরে? ঘুম আসছে না সে ভালোই, আমি শিল্পী এই রাত, আমাকে অনেক দিয়েছে, আরও কিছু দেবে।

চাঁদ ঢলে পড়ল পশ্চিম আকাশে, নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে সে উঁকি মারছে। সে কি দেখতে চায় দু'টি প্রাণীর লীলাখেলা? তার আলো কিছুক্ষণ সরাসরিই পড়ে রইল মশারির ওপর। এবং পরে আস্তে আস্তে সরে গেল।

আমার মনে একটা বিদ্‌ঘুটে ভাব জেগেছে। আস্তে আস্তে উঠে ছোট্ট হারিকেনটা খুঁজে নিয়ে জ্বালাই।

সলতেটা যথাসম্ভব কমিয়ে রেখে শিয়রের দিকে এসে মনোযোগ দিয়ে দেখি ছবি গভীরভাবে শ্বাস ফেলছে। সহজে ওর ঘুম ভাঙবে না এ নিশ্চিত। সাবধানে বিছানায় উঠলাম, বাতিটা একধারে রেখে ওর সমস্ত আবরণ খুলে ফেলতে থাকি। আমি দেখব ওকে। এতদিন যাকে ঘিরে আকাশ-কুসুম রচনা করেছি, এত কাছে পেয়েও তাকে দু'চোখ ভরে একবার দেখতে পারবো না? অনেকদিন পরে এ ঔৎসুক্য থাকবে না হয়তো, থাকলেও এমন করে থাকবে না সুতরাং যতক্ষণ আছে ততক্ষণ উচিত মূল্য দিই।

একটা চাপা উত্তেজনায় হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তবু বাতিটা তুলে আনলাম, সলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে ধরি। পরিষ্কার আলোকের মধ্যে ছবি পড়ে আছে সত্যি বড়

নিটোল ওর দেহখানি। অঙ্গের বাঁকে বাঁকে, ভাঁজে ভাঁজে কি সুন্দর সুষমা! বহু সাধনায় ছেনিয়ে তোলা মর্মরমূর্তির মতো।

কিন্তু একি! এ সব কিসের চিহ্ন! ভালো-মত দেখতে গিয়ে কপালের দু'পাশের রগ ছট্‌ছট্‌ করতে থাকে। বই পড়েছি, ভুল হতে পারে না, এযে স্পষ্ট মাতৃত্বের ছাপ! নুয়ে ওর শরীরটা শুঁকে শুঁকে দেখি এসেন্সের আড়ালে আরো একটি গন্ধ আছে, যা, কেবল মায়ের গায়েই থাকতে পারে; তা হলে ছবি কি এতদিন প্রাণপণে লুকিয়ে এসেছে কিছু?

ও একটু নড়ে উঠতেই তাড়াতাড়ি বাতিটা কমিয়ে খাটের নিচে রেখে দিলাম।

পাশ ফিরতে গিয়েও হঠাৎ ধড়ফড় করে জেগে উঠল। আমাকে স্পর্শ করে বলল, একি! তুমি এখনো ঘুমাওনি?

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে একেবারে অনাবৃত দেখে ঝট্‌ করে উঠে বসে। আমি শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুমজড়ানো স্বরে এবার বললাম, কি হয়েছে!

ছিঃ ছিঃ; এ নিশ্চয়ই তোমার কাণ্ড; এতক্ষণ এসব পাগলামিই তুমি করেছ?

কই কিছু করিনি তো?

নাহ্‌ একেবারে সাধুপুরুষ। ছি ছি। লজ্জায় বাঁচিনে।

নীচে নেমে কাপড় পরবার পর ও জানালার কাছে গেল। চাঁদ হয় অস্ত গিয়েছিল নয় অনেক আড়ালে জানলাটা, তাই অন্ধকার। গাছপালায় ভোর হওয়ার আগেকার ঘোর লাগা ছায়া। শেষ রাতের হাওয়া বইছে। একদল পাখি কিচিমিচির করতে করতে উড়ে গেল। একটু পড়ে শোনা গেল বহুদূরের মিনারের প্রথম আজান।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছবি মাথায় কাপড় দেয়। পরম রজনী শেষ হয়ে এল, এখন সে পরিতৃপ্ত।

এবং আমিও যা পেয়েছি জগতের মাপকাঠি দিয়ে তার পরিমাপ অসম্ভব সে গোপনচারী তাকে ধরা যায় না। কেবল দেহের প্রতি আনাচে কানাচে অস্থির অভ্যন্তরে শিরায় শিরায় প্লাবনের মতো এসে কিছুক্ষণের জন্য মৌন মূক করে রাখে, তারপর চলে যায় কিন্তু বর্ষার শেষে পলিমাটির মতই রেখে যায় অমৃতের স্বাদ! আমিও তাকে তেমন করেই পেয়েছি।

কিন্তু তবু ঝাঁপি ভরে অনেক ফুল তোলার পর আঙুলের একটি কাঁটা ফোটার মতো মনের অতলে একটুখানি সন্দেহ খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। ছবি আমার কাছে লুকিয়েছে কিছু?

✪

সাত

মনে মনে পর্যালোচনা করে বুঝতে পারি এ এমন একটা ব্যাপার যা নিয়ে হৈ-চৈ করা চলে না। শাঁখের করাত আসতেও কাটে যেতেও কাটে। এও তেমনি উভয় সঙ্কট যদি কিছু ঘটেও থাকে তবু সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে যাওয়ায় বিপদ আছে; কারণ তার প্রতিক্রিয়া কি হয় বলা মুশকিল। ও সাবধান হয়ে নিজেদের মধ্যে আরও গুটিয়ে যেতে পারে নয়তো পেতে পারে দুঃখ। আবার কিছু না বললেও মানসিক যন্ত্রণা।

তার চেয়ে ব্যাপারটা আস্তে আস্তে ভুলে যাওয়াই বোধ হয় ভালো। মেয়েমানুষের শরীর তার ওপর বিশ্বাস নেই বিনা কারণেও এমন হতে পারে। তাছাড়া নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতা শূন্য থাক, এইতো উত্তম পন্থা। যেমন করে পেয়েছি এ পাওয়ায় কোন ফাঁকি নেই। এটুকুনই সত্য হোক না কেন। আসলে তো প্রত্যেকটি মানুষ একেকটি স্বতন্ত্র দ্বীপ। কে কাকে পুরোপুরি জানে? জানা সম্ভব নয়। অন্তর বাহির কারুরই এক হতে পারে না। সে শুধু দোষ ঢাকবার জন্য নয়, বরং এমন জিনিশও আছে মঙ্গলের খাতিরেই যা গোপন রাখা সমীচীন। ছবি যদি তেমন কিছু গোপন রেখে থাকে তা'হলে তো ওর কোন অপরাধ নেই?

কিন্তু তবু আভাসে ইঙ্গিতে সুযোগ-মতো ওকে বাজিয়ে নিতাম। কোন আকস্মিক আঘাতে আচমকা বেরিয়ে আসত হয়তো ওর না-বলা কাহিনীর এক টুকরো।

কিন্তু সেরকম পরীক্ষা চালাতেও ইচ্ছে হল না। নিজের অজান্তেই আমি যে ভুলে গেছি সব! কারণ মাসখানেকের মধ্যেই ছবির দেহে ভুবন ভোলানো রূপ ফুটে উঠেছে ঠোঁটজোড়া মেদুর কোমল, গালে আপেলের রং চোখে যেন স্বপ্নের ঘোর। কণ্ঠস্বর মিষ্টি মধুর। ধীরস্থির চলনে বিজয়িনীর অব্যর্থ গরিমা। দেবীর মতো অভ্রান্ত পদক্ষেপে সে আমার ছোট্ট ঘরটিকে এবং ততোধিক অকিঞ্চিৎকর জীবনটিকে আলোকিত করে তুলেছে। এক অঙ্গে এত রূপ জানতাম না, চাইলে চোখ ফেরানো যায় না, এমনি।

বৌদি সেদিন ঠাট্টা করে বললেন, আবার আসবার সময় দোলনা কিনে আনব একটা আগেভাগেই তৈরি হয়ে থাকা ভালো কি বলো?

প্রাচুর্যের ধারা খুলে গেছে, মনটা সারাক্ষণ তাই শিহরিত থাকে। ঘরে নবজাতকের পদধ্বনি, বাইরে ফসলের আগমনী। শারদীয় ছুটিটা কাজের মত্ততা দিয়ে ভরে তুলি। মাঠে মাঠে ধান, গাঁয়ের পথে কৃষকদের ব্যস্ততা, ঘরে ঘরে একটা উল্লাসের রেশ। যাদের জমি নেই তাদের কাজ মিলছে, বগলে কাস্তে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। সপ্তাহে একদিন আমরা বেরোই বাইরে; আমরা ছয়জন-দাদা বৌদি ছেলেমেয়ে এবং আমরা দু'জন। যেদিন যেদিকে ইচ্ছে চলে যাই রাজধানী ছাড়িয়ে অনেক দূর পয়সাকড়ি কিছু থাকে সে জায়গাতেই খাবার জোগাড় করে খাই। দু'দিন তো গেরস্থ বাড়িতে দাওয়াতই মিলেছে সে কি আদর যত্ন! দুধ-গুড় পিঠা পায়েস!

বাইরে বেরিয়ে জামিলভাই অনেকগুলো ভালো ওয়াটারকালার করেছেন সেটাই বড় কথা আমিও কম আঁকিনি। কিন্তু আঁকাটাই বড় কথা নয় বরং বৈচিত্র্যের স্বাদ,

শহরের বদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এক অপূর্ব মুক্তি। পৃথিবীর কবিতা মরে না কখনো এই সত্য নতুনভাবে উপলব্ধি করি। শালিক টুনটুনি ধানের শিষ ঘাসফড়িংকে কতকাল ভুলে ছিলাম কিন্তু এরা যে পরম আত্মীয়! তাই বোধ হয় নতুন করে পেলাম

সেদিন সকালে খাওয়া-দাওয়া করে বাইরে বেরিয়েছিলাম একলা, সন্ধ্যের সময় ফেরার কথা। কিন্তু পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেল। ছবি কিনবেন বলেছিলেন, বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় চলে আসব ঠিক করলাম। রাশেদ বলছিল বাসায় যখন বলে এসেছি ওর ওখানে গিয়ে বিকেলটা কাটিয়ে দিতে, এমনকি, ইংরেজি ছবির মেটেনী শো দেখবার অফারও ছিল। কিন্তু মনটা বাসায় আসার জন্য রুখে উঠেছে।

বললাম, নতুন একটা অয়েল শুরু করেছি, এখন সেটার ওপর কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে বড়

আরে রাখ্। রাত্রে কাজ করলেই চলবে! আর এত এঁকে কি হবে? জীবনে দু'তিনটে কাজ করবি এরপর দাড়ি রেখে গম্ভীর হয়ে বসে থাকবি ব্যস্ নির্ঘাৎ বিখ্যাত! আসল শিল্পীরা আঁকে না, আঁকার ভান করে!

আমি তো আঁক্ছি না, রং তুলি দিয়ে হাতের চুলকানো মেটাচ্ছি মাত্র! বুঝলে কিনা?

রাশেদকে এককাপ চা খাইয়ে বিদায় নিয়ে এলাম। আসবার সময় ও পরিহাস করে বলল, আরে শালা লঙ্কায় গেলেই হনুমান। এদ্দিন হয়ে গেল এখনো এত টান, ভীমরতি আর কাকে বলে!

এর জবাবে কিছু না বলে শুধু একটু হেসেছিলাম। বালখিল্যতার কাছে চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। পুরুষের সংস্পর্শে না এলে নারী পূর্ণ হয় না, আবার নারী সংসর্গহীনতায় পুরুষও থাকে অপূর্ণ। গাছের মতো পাশাপাশি না বাড়লে উভয়ের খর্বত্ব অবশ্যম্ভাবী এদেশে মেয়ের সঙ্গে ছেলের দেখা হয় একবারই বাসরঘরে আর সে দেখা দুজনকে কদাচিৎ সমৃদ্ধ করে। তা'তে দেহের ক্ষুধা মেটে কিন্তু মেটে না মনের দাবি দৌড়-ঝাপ, খেলাধুলা, হাসিকান্নায় পরস্পরের গন্ধ শুঁকে বড় হতে না পারলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ধারা চোরাবালিতে মুখ গুঁজে থাকবেই!

একটি সাধারণ মেয়েরই সংস্পর্শে এসে আমি কতটা বিস্তৃতিলাভ করেছি বন্ধুরা তা জানে না। উপলব্ধি করার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাই সময়ে অসময়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ।

বাসার কাছে এসে একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে মাথায়। আমি সন্ধ্যায় ফিরব এ বিষয়ে ছবি স্থিরনিশ্চিত; কাজেই কাছে গিয়ে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে ওকে চমকে দেওয়া যাবে।

দোরের পর্দা ফাঁক করে পা টিপে ঘরে ঢুকলাম। ছবি কোণার জানালার ধারে বসে আছে পেছন ফিরে খোলাচুলের মাথাটা কোলের দিকে নীচু করা। কিন্তু আশ্চর্য, ওর ডানহাতের কনুইয়ের কাছে দু'টি ছোটো ছোটো পা, মাঝে মাঝে নড়ছে নিশ্চয়ই শিশুর পিঠের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে দেখি সত্যই বাচ্চা। চিনতে পারি অধ্যাপকের ছেলে,

মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো মাঝে মাঝে তুলছে। আমি হতভম্ব নির্বাক; আস্তে আস্তে বরফের মূর্তির মতো জমে যেতে থাকি।

যেভাবে ঢুকেছিলাম তেমনি চুপি-চুপি উঠে বেরিয়ে এলাম। স্টুডিও ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিই। ছবি সন্তানের জননী এ বিষয়ে আজ আমি একেবারে নিঃসন্দেহ

ওর উৎকট শিশুপ্রীতির একটা হদিস পাওয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরতলায় যাওয়ার আগে ছবি স্টুডিওতে একটু উঁকি মারল। আমাকে দেখতে পেয়ে একেবারে তাজ্জব। ঘরে ঢুকে বলল, ওমা! তুমি যে!

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললাম, হ্যাঁ আমি। অবাক হয়ে গেলে বুঝি?

তা নয়তো কি? আমি আশাই করিনি। কেন গিলবার্ট সাহেবের কাছে যাওনি?

গিয়েছিলাম। পাইনি তা'কে। কেন, চলে আসায় তোমার কেনো অসুবিধা হল নাকি?

না, না। সে কেন হবে! ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, ওর মা একটু রাখতে দিয়েছিল! রাখ ওকে দিয়ে আসছি!

ছবি আর অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরুবার পর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি মাড়িয়ে ওপরে গেল।

আমি ওঠে গিয়ে এলবামটা আনি। ছবির বহু যত্নে করা জিনিশটা, চকচকে কোণ দিয়ে প্রত্যেকটি ছবি লাগানো। প্রথমদিকের পাতাগুলোতে আমাদের ছবি দু'জনের নানা ভঙ্গিমার। ম্যারাজ গ্রুপটা প্রথম পৃষ্ঠায়। বেনারসী শাড়ি, নেকলেস, টিকলি-পরা আধো-ঘোমটার মাঝে ছবি লাজুক লতাটি, আমি তার পাশে স্বমূর্তিতে বিরাজমান। রাশেদ ক্যামেরা এনে অনেকগুলো স্ন্যাপ নিয়েছিল একদিন, সে সমস্তই আছে। একটাতে আমি আঁকছি ছবি সিটিং দিচ্ছে; আরেকটা, ছবির মাথায় ফুল গুঁজে দিচ্ছি। অন্যটাতে দাঁত বার করে হাসছি দু'জনেই। জীবনের একেকটি মুহূর্ত কিন্তু কোনটাই তো কৃত্রিম নয়? এলবামে আর আছে দাদার ছবি বৌদির ছবি। নোটন-শিউলির ছবি কলকাতার কিছু দৃশ্যও আছে।

ছবি নেমে এল। কাছে এসে বলে উঠল, একি! হঠাৎ এলবাম দেখার শখ?

এই এমনি! আমি বললাম, আর শখ জিনিশটা তো হঠাৎই জাগে!

তাই নাকি? এত সূক্ষ্ম দর্শন আমি বুঝিনে, বাপু। ছবি আমার কাধে ভর দিয়ে রহস্যপূর্ণ স্বরে শুধাল, একটু যেন গম্ভীর মনে হচ্ছে? ব্যাপার কি?

বয়স হচ্ছে, মাঝে মাঝে একটু গম্ভীর হওয়া দরকার।

আরে বাব্বাহ্! সত্যিই দেখি রাগ করেছ! ছবি দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে আবদারের সুরে বলল, কি হয়েছে বল না?

কিছু হয়নি! আমি হাসবার চেষ্টা করে বললাম, ছবি বিক্রির ব্যবস্থাটা করতে পারলাম না, খুব খারাপ লাগছে।

সত্যি? ছবি উচ্ছল হয়ে বলল, তা'হলে তোমাকে একটা জিনিশ খাওয়াব!

কি জিনিশ?

এখন বলবো না। খোলা আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে ও বড়ঘরে চলে গেল। একটু পরে এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, চোখ বোঁজ, এবং হ্য কর।

কি জিনিশ দেখিই না একটু!

না। আমার কথা না শুনলে দেব না! বেশ এই নাও।

চোখ বুঁজে হ্য করতেই ও গোলমতো একটা খাদ্যবস্তু টুপ করে ছেড়ে দিলে। চিবিয়ে দেখি নারকেলের নাড়ু।

এরপর বাঁ হাতে ধরা পিরিচটা ডান হাতে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন হয়েছে!

চিবোতে চিবোতে বললাম, বেশ।

আমি সব দেখেছি, ছবি টের পায়নি, তাতে একটু সুবিধে হল বটে; কিন্তু বুকের ভিতরে যে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তাকে কতদিন ঢেকে রাখব? তা'তে জমবেই বাষ্প, নীলবিষের মতো কুটিলস্রোত, আর তা বাড়তে থাকবে ক্রমশ এবং কোন দুঃসময়ে অগ্নিগিরির জ্বালামুখ ফেটে যাওয়ার মতো প্রবলবেগে বিক্ষিপ্ত হবে। যে সুখ স্বর্গ গড়ে তুলেছি, নিজের হাতে তা ভাঙতে যাওয়া মহাপাপ, অথচ এখন মনের যে অবস্থা বোঝাপড়া না করেও উপায় নেই।

বিকেলে ছবি সেজেগুজে তৈরী হল [illegible]দির ওখানে যেতে চাইলে বললাম, আমি না গেলে হয় না? একটু কাজ করব জানালাম।

ছবির অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। কারণ আমার মুখ থেকে এমনি সময়ে এই ধরণের কথা এ পর্যন্ত শোনেনি। ও কোথাও যেতে চাইলে শত কাজ থাকলেও ফেলে গিয়েছি। ও ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, বেশ, তবে কাজই কর। আমাকে একটা রিক্শা ডেকে দাও।

একলাই যাবে? জিজ্ঞেস করলাম।

ও বলল, কি আর করব। গুণ্ডায় যদি ধরে তোমার জিনিশই নিয়ে যাবে, আমার কি? নিজের জন্য আমার কোন চিন্তা নেই।

আমি কপাল কুচকে জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে, নিজের জন্যে তুমি বাঁচতে চাও না? বেঁচে আছ শুধু আমার জন্যে?

ছবি কি ভেবে নিয়ে বলল, যদি বলি তাই?

বললাম, প্রমাণ চাইব।

এত কিছুর পরও প্রমাণ? ছবি ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, না, তোমাদেরকে সত্যি নির্ভর করা যায় না!

আর তোমাদেরকে বুঝি খুব যায়? আমার কথায় উষ্মার রেশ লাগলো, সে বিষয়ে সচেতন হওয়ায় শান্তস্বরে বললাম, বেশ চলো। তোমার সঙ্গে গেলেই তো আর কোন ক্ষোভ থাকবে না?

না, থাক্। ছবি হাতব্যাগটা টেবিলে ফেলে দিয়ে বলল, যাব না আজকে

কি ব্যাপার। উল্টো রাগ করলে নাকি? ও বেতের মোড়ায় বসে পড়েছিল আমি কাছে গিয়ে বললাম, আমি তো খারাপ কিছু বলিনি?

ছবি আমার হাতটা ওর কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, না তা নয়। যাবোই না আজকে। কোন কাজ তো নেই।

সার্ট গায়ে দিতে দিতে বললাম, এমনই যখন করছ যেতেই হবে। না গেলে এখন আমি রাগ করব। তবে বৌদির ওখানে যাব না! চল একটা ছবি দেখব।

ছবি আমার কথার জবাব না দিয়ে আঙুলের নখ খুঁটতে থাকে। ওর ভিতরে একটা আলোড়ন চলছে বুঝতে পারি। গুরুতর কিছু নয়। আলোছায়ার খেলা একটুখানি। সত্যি মেয়েদের মন অতি সূক্ষ্ম জিনিশ।

আমি চটপট তৈরি হওয়ার পর রাস্তায় গিয়ে একটা রিকশা নিয়ে এলাম।

হয়তো কেউ চাইনি। কিন্তু তবু দু'জনের মাঝখানেও ধীরে ধীরে নেমে এসেছে নীরবতার দেয়াল, দু'একবার কিছু বলবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক। আলাপে সুর লাগেনি। পৌনে দশটায় বাসায় ফিরে কাপড় বদলাতে বদলাতে শুধোলাম, কেমন লাগল ছবিটা [illegible] বললে না তো?

কি আর বলবো! আলনা থেকে একটা ব্যবহারী শাড়ি তুলে নিয়ে ছবি বলল, ইংরেজী ছবি আমার কখনো ভালো লাগে না। বড্ড বেশী উলঙ্গ!

উলঙ্গ নয়, বল বলিষ্ঠ। জীবনটাকে ওরা বলিষ্ঠভাবে নিতে জানে বলেই তার প্রকাশটাও বলিষ্ঠ।

তা বটে। একজনের বৌ হয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি মাখামাখি করার মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে বৈকি!

আমাদের দেশের মেয়েরা যা গোপনে করে সে দেশের মেয়েরা কারুর প্রেমে পড়লে ছলনা দিয়ে তাকে ঢাকে না, এতে অপরাধ কোথায়?

না অপরাধ নেই! এক জায়গায় পচে মরার চেয়ে ফুলে ফুলে মধু খাওয়া বরং আনন্দদায়ক!

ছবি তেরছা কথা বলতে শিখেছে মন্দ নয়। নীরবতার দেওয়াল ভেঙে গেছে কিন্তু এখন পড়ছে ধরা-না-দেওয়ার কাঁটাতার।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করে নিয়ে গিয়ে বিছানায় কাত হলে আমি বসে ওর চুলে আদর করতে থাকি। সিগারেটটা পুড়ে শেষ হলে আস্তে ডাকলাম, ছবি।

কি!

একটা কথা জিজ্ঞেস করি জবাব দেবে তো?

কোন্‌দিন জবাব দিইনি বলতো? ঘাড়ের কাছে হাত ভর দিয়ে পাশ ফিরে শুল!

ওর মনটা হালকা হয়ে গেছে দেখে আশ্বস্ত হলাম। বললাম, কথাটা বলবো কি ভাবছি।

আমার গলা গম্ভীর এবং গুরুতর; ছবি এবারে একেবারে উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার! মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কিছু?

মিথ্যে বলনি, একে সাংঘাতিকই বলা যায়! আমি অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকি

ছবি অধীর হয়ে বলল, কি ব্যাপার বলো!

হঠাৎ মগজের একটি কোষে যেন এক ঝলক দুষ্টরক্ত উজিয়ে গেল। আর তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম, তোমার একটা ছেলে হয়েছিল একথা সত্য কিনা?

তার মানে? ছবির মুখখানা একটি ফুৎকারে বাতির শিখা নিভে যাওয়ার মতো একেবারে রক্তহীন, সে যেন কাঁপছে মৃগীরোগীর মতো। ফিস্‌ফিস্ করে কোন মতে উচ্চারণ করল, তুমি কি বলছ এসব?

সত্য বলছি, তুমি সন্তানের জননী! আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার মাস ছয়েক আগে তোমার ছেলে হয়েছিল!

মিথ্যে! মিথ্যে! সব দুষ্টলোকের কারসাজি! আমাদের সুখ সইতে পারছে না। কে বলেছে একথা? বল, বল কে বলেছে?

কেউ বলেনি আমি নিজেই বুঝতে পেরেছি।

ছবি অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল, তুমি ভুল বুঝেছ, সব ভুল!

না, না, ভুল নয় এ সত্য। আমি ক্ষিপ্তের মতো ওর দু'কাঁধে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে থাকি, কেন, কেন? কেন এমন প্রতারণা করলে! বল নইলে গলা টিপে মেরে ফেলব!

ছবির দু'চোখ থেকে দরদর্‌ করে পানি বেরিয়ে এল। বলল, আমাকে মেরে ফেল তুমি, সেই ভালো! সেই অনেক ভালো।

হিংস্রচোখে চেয়ে আরো দৃঢ়স্বরে আমি বললাম, যা ভেবেছ সহজে তোমাকে ছাড়ছিনে। বলতে হবে! সব বলতে হবে। বলো!

আমার চিৎকারে দরোজা-বন্ধ ঘরটা কেঁপে উঠল, ছবি বাঁ হাতে আমার মুখ চেপে ধরে! সে কাঁপছে আমিও কাঁপছি।

ছিঃ ছিঃ! এমন করো না। লোক জড়ো হবে! বলবো সব বলবো শুনতে যখন চাও নিশ্চই বলবো!

আমার মুখ ছেড়ে দিয়ে ও কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। ঘন ঘন ভারী নিঃশ্বাস পড়ছিল, আস্তে আস্তে কমে। স্থির হয়ে বসে স্বগতোক্তির মতোই বলল, আমি জানতাম এমন হবে একদিন। আর সেজন্যই তোমাকে বারণ করেছিলাম। কিন্তু আমার মানা তো তুমি শোননি? দেখলাম সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাস, সব দোষ ঢেকে দেবে, সব

ক্ষতি সব বঞ্চনা। তবু তোমাকে বলতাম। কিন্তু বড্ড ভয় হল। হতভাগী আমি, তোমাকে পেয়েছি হয়তো অনেক জন্মের পুণ্যের ফলেই। তাই বড্ড ভয় হল। বললে যদি তোমাকে হারাই। দুর্ঘটনা একটা ঘটেছিল, সেটাই তো জীবনে চরম সত্য নয়। তোমাকে পেয়ে তার শেষ দাগটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে, তাহলে মিছে পীড়িত হয়ে থাকি কেন। ভাবলাম ঐটুকু থাক্, কোনদিন সুযোগ এলে বলবো। কিন্তু সেই সুযোগ যে এত তাড়াতাড়ি এমনভাবে আসবে তা বুঝতে পারিনি!

আমি বিপর্যস্ত ভস্মীভূত, শুধু বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকি। আঁচলে চোখ মুছে ছবি বলে চলল, আজ আমি কিছু লুকোবো না। সব বলবো। তুমি বিশ্বাস করতেও পারো নাও পারো। একটি মিনতি শুধু জানাব, তোমাকে একবিন্দু ফাঁকি আমি দিইনি এইটুকু যেন বোঝবার চেষ্টা কর। সেরকম কিছুর সম্ভাবনা আছে বুঝলে আমি প্রথমেই এই ঘটনাটি বলে নিতাম। আমি একবারই ভালোবেসেছি এবং সে তোমাকেই মরি আর বাঁচি এটাই আমার জীবনের পরম সত্য! এ সত্য পদদলিত হলেও হতে পারে। কিন্তু সত্যের মৃত্যু নেই।

ছবি একমনে প্রায় ফিস্‌ফিস্ স্বরে আরো কত কি বলে যাচ্ছিল। এক সময় গিয়ে কিছুই আমার কানে ঢুকল না। সারাদেহে মৃত্যুর মতো ক্লান্তি, ঝিমিয়ে এসেছে চোখ। শরীরটা কখন এলিয়ে পড়ল তাও বলতে পারবো না। বাইরের জগৎ নিমজ্জিত হয়ে গেল তা একরাত্রির জন্যে বটে কিন্তু আমার চেতনায় অনন্তকালের মতো।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি ছবি আলুথালু বেশে আমার বুকের ওপর আমার চোখেমুখে ছড়িয়ে আছে ওর চুলের রাশি, আর আমি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছি

আট

দুই জনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে দুটি অন্তঃস্রোত, এক মোহনায় গিয়ে কোন্ মুহূর্তে মিলবে জানি না; এখন সারাদিন শুধু মূক করে রাখল।

রাত্রে আবার খুলে যায় একটি ধারার মুখ। আমি বালিশে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছি, ধোঁয়াগুলো উড়ে উড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাছে বসে ছবি শুরু করল, আমাকে তোমার কাছে আর থাকতে দেবে কিনা জানি না, তবে বলে শেষ করতে দাও আমার কাহিনী তখন বৌদি সবে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। দাদা একদম উদ্‌ভ্রান্ত। সারাদিন বাইরে থাকেন। ঘরে চাল বাড়ন্ত সেদিকেও খেয়াল নেই। পান্নাদের বাসা থেকে ধারকর্জ করে চালাচ্ছি। একদিন দাদা একটি লোককে নিয়ে এলেন। স্যুট টাই পরা বেশ ধোপদুরস্ত। দেশী লোক কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলেন। নাকি বিরাট মার্চেন্ট! পৃথিবীর বড় বড় শহরে তার কারবার। মাসের পনেরোদিনই উড়োজাহাজে থাকেন। দেদার টাকা। দাদার কাছে এসেছেন তার ফার্মের একটি মনোগ্রাম করবার জন্য। একহাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছেন। টাকা পেয়ে দাদার খুব ফুর্তি। আমাকে চা করে নিয়ে যেতে বললেন। আমার না করবার উপায় ছিল না। লোকটি খুব জবরদস্ত, ভারী গোঁফ তার। ঘরে ঢুকে তার চোখ দেখে আমি ভেতরে-ভেতরে শিউরে উঠি। দাদা তো আপনভোলা লোক, এসব তার নজরেই পড়বার কথা নয়, অথবা পড়লেও বিশেষ আমল দিলেন না।

কিন্তু আমি দেখলাম, লোকটি ভয়ানক ধূর্ত আর যতদূর সম্ভব বদমাশ।

দু'দিন পরে এসে দাদাকে ডাকতে ডাকতে একেবারে বাড়ির ভেতর চলে এলেন। দাদা ছিলেন না। আমি সরে পড়বার উদ্যোগ করছিলাম। কিন্তু বাসায় লোকজন নেই বুঝতে পেরে —

কথা থামিয়ে ছবি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, আমার শিথিল হাতটার দু'টি আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

আমি চিৎকার করতে চেয়েছি, মুখের ওপর জুতো ছুঁড়ে মেরে বাধা দিয়েছি। কিন্তু বেশীক্ষণ পারিনি।

একখণ্ড মেঘ বোধ হয় উঠে এসেছিল, জানালার বাইরেটা আবছায়ায় ঢেকে গেল। আমি সেদিকে চেয়ে থাকি।

সারা বিকেলটা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদলাম। এও কপালে লেখা ছিল? কাকে বলব কেমন করে বলব? দাদাকে বলা সে কি লজ্জা! বৌদি সবে ঝগড়া করে গেছেন আসবেন না, বাইরের কাউকে তো বলাই যায় না। এক বলা যেত পান্নাকে। কিন্তু সে শহরেই নেই, শ্বশুরবাড়ি। দিন যায় রাত আসে। রাত শেষ হয় আবার দিন আসে, আমি বোবা লাশের মতো চলাফেরা করি। দাদা কিছু বুঝতে পারে না লোকটাও উধাও হয়ে গেলেন। দাদা একদিন বললেন, কি অদ্ভুত এক হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে জিনিশটা নিলেনই না ভদ্রলোক! আমি সব জানতাম, কিছু বলিনি।

এদিকে কিছুদিন না যেতেই আমার দেহে অজানা পরিবর্তন শুরু হল। কি লজ্জা! লুকিয়ে লুকিয়ে টক ঝাল পোড়ামাটি খাই। আরও কত কি! নিজেকে নিয়েই আছি।

কিন্তু কতদিন ঢেকে রাখব! এ তো গোপন রাখবার জিনিশ নয়। মন লুকিয়ে রাখছে, শরীরের মধ্যে দিন দিন সেই প্রকাশ পাচ্ছে। দাদা একদিন শুধু বললেন, একি ছবি!

একদিন বৌদি এসে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বিস্ময় কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একি ছবি!

আমি দৌড়ে গিয়ে তার বুকে আশ্রয় নিই। চোখের পানিতে গাল ভেসে গেল অনেকক্ষণে বললাম, আমাকে বাঁচান বৌদি।

বৌদি আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, কিন্তু তোর এ সর্বনাশ কে করল। কিভাবে করল।

ঘরের দরোজা ভেজিয়ে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। বৌদি সব শুনে এতটুকুন হয়ে গেলেন। বললেন, সর্বনাশ হয়েছে রে সর্বনাশ!

কি হবে আমার বৌদি। আমি কি বিষ খাব, না পালিয়ে যাব কোথাও?

বৌদি সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন না, এ সব কিছু নয়। একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে।

এরপর যা বললেন, তা শুনে আমার বুকের ভেতরটা ধুক্‌ধুক্ করতে থাকে। জানি এই একমাত্র পন্থা। কিন্তু তবু মনটা এমন করছে কেন, যে এসেছে তার তো কোনো অপরাধ নেই? সে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ। ফুল কলির মধ্যে থাকতেই তাকে ছিঁড়ে পিষে ফেলা। সমাজ আছে, কিন্তু তার চেয়ে বড় বিবেকও তো মরে যায়নি? আসলে বিবেকও নয়, বিন্দু বিন্দু রক্তে যে গড়ে উঠছে তার প্রতি কেমন একটা দুর্বোধ্য টান। আমি আস্তে বললাম, বৌদি আমি পালিয়ে যাই। কিংবা দূরে কোনো অচেনা শহরে ব্যবস্থা করে দাও। আমার জীবনটা তো নষ্ট হল। অন্য একটা জীবন বাঁচুক।

বৌদি কপাল কুঁচকে ভাবলেন কিছুক্ষণ এরপরে বললেন, তা হয় না ছবি। তোর দরদ কেন, সে আমি বুঝি। কিন্তু এদেশে কোন দামই তার নেই। বরং ওভাবে গেলে পথের কুকুরের মতো মরতে হবে।

বৌদি! আমি লুটিয়ে পড়লাম। গমকে গমকে কান্না আসছে।

তোর কিচ্ছু ভাবনা নেই। আমিই সব ব্যবস্থা করছি। বৌদি বললেন, আমার এক বান্ধবী ভালো ডাক্তার। অনেক দেরী হয়ে গেছে, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি ওর কাছে

তিনদিন তিনরাত্রি পর্যন্ত ছোট্ট বাসাটা হত্যা-ষড়যন্ত্রে চকিত হয়ে রইল। এমনিতেই লোকজন আসে কম। পান্না থাকলে সে আসত মাঝে মাঝেই . কিন্তু এখন ভেতর থেকে গেটের চাপানি দেওয়া থাকে। পরে জনতে পেরেছি দাদা নাকি তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন এমন ভদ্রলোক তার এই কাণ্ড। প্রথম বিশ্বাস করতে পারেননি। পরে

বুঝতে পেরে ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছিলেন। শহরের বড় বড় হোটেলে আতিপাতি করে খুঁজেছেন; কিন্তু কোথায় পাবেন তাকে? সে সময়েই কোথায় চলে গিয়েছিলেন।

বৌদির সঙ্গে কথা না বললেও দাদা আপন মনে গজরান আর যোগাড়যন্ত্র নিয়ে থাকেন।

সাতদিনে উঠে বসি কিন্তু ভালোমতো চলাফেরার শক্তি অর্জন করতে মাসখানেক লাগল

আবার নীরবতা। প্যাকেট থেকে তুলে নিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাই। আমার কোন অনুভূতিই যেন আর নেই। হৃৎপিণ্ডটা শুধু স্বাভাবিক চালে টিপ্‌টিপ্ করে চলছে। হৃদয়ের মধ্যে ধোঁয়াটে বুদবুদের মতো যা উঠছে পড়ছে তা অবয়বহীন, খাপছাড়া এলোমেলো। জীবনের সার্থকতা, ব্যর্থতা-কত প্রশ্নই আজ নতুন করে দেখা দিল. দুদিন আগেও নিজেকে মনে হত রাজার মতো আর এখন পরাজিত সৈনিক!

সেরে উঠলাম বটে-ছবি আবার মুখ খুলল কিন্তু অদ্ভুত এক খ্যাপামিতে পেয়ে বসল প্রায় পূর্ণশিশু বিষাক্ত ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু জীবন্ত ছিল না. মায়ের গর্ভ থেকে পড়ে সে কেঁদে ওঠেনি। কিন্তু তবু তাজ্জব একটু একলা থাকলেই শিশুর কান্না শুনতে পেতাম-যেন কাছেই কখনো কুয়োর ধারে কখনো রান্নাঘরে কখনো বারান্দায় মাঝে মাঝে আকাশের দিকেও। ব্যাকুল হয়ে ছুটে যেতাম কিন্তু গিয়ে খুঁজে দেখতাম কেউ নেই কিছু নেই। তাহলে এ আমার মনের ভুল?

ফিরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতাম। এক আশ্চর্য পরীক্ষায় ফেললেন আমায় খোদা! এর হাত থেকে কি আমার মুক্তি নেই?

একদিন শুয়ে ছিলাম পাশ ফিরে দেখি আমার কোলের কাছে নাদুস নুদুস একটা শিশু হাত নেড়ে হাসছে। ধরতে গিয়ে দেখি শূন্যস্থান। দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

একদিন বিকেলে আসমানের দিকে চেয়ে আছি দেখি মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একদল শিশু!

চোখ কচলিয়ে চাইতেই তারা যেন করতালি দিয়ে এক নিমেষে সব লুকিয়ে পড়ল.

ছবি একটু থেমে শেষবারের মতো বলল, অনেকদিন হয়ে গেল কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে ভুল করি আমি এবং যে কোন শিশুর কান্না সইতে পারিনে। ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়।

কথা বলতে বলতে ওর গলা ভারী হয়ে এসেছিল, সে বালিশে মাথাটা এলিয়ে দিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মশারিটা খাটিয়ে দিয়ে আমি নামলাম। আচ্ছন্নের মতো ঘরময় পায়চারী করতে থাকি. এরপর দরোজা খুলে বারান্দায় গেলাম। শাদা মেঘগুলো দক্ষিণ থেকে মৃদুমন্দ গতিতে উত্তরে উড়ে যাচ্ছে, রাতের আকাশে পূর্ণচাঁদের মাতাল জোছনা। ছড়িয়ে পড়ছে অফুরন্ত ধারায়। একি জোছনা অথবা ধারালো পরিহাস? মেথর পল্লী থেকে টিমিক টিমিক ঢোল-করতালের বাজনা ভেসে আসছিল, সাধারণের কি উল্লাস! ফুর্তি করছে সারাদিনের খাটুনির পর মদ আর তাড়ি টানছে দেদার, মেয়েমানুষের গলা জড়িয়ে

মাতলামি করছে। হ্যাঁ এরাই সুখী! সত্যিকারের সুখী। কারণ এদের মনের বালাই নেই। বৌয়ের সঙ্গে এসেছে তার পূর্বস্বামীর ছেলে তাকে খাওয়াও মারধোর করো এর পর কাজে লাগাও! বাগ মানতে না চাইলে বিদায় দাও। আসলে বিয়েশাদী ব্যাপারটাকে একটা নেহায়েৎ দরকারী কাজ বলে ধরে নিতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান। মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলির সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেলার মতো বোকামি আর কিছু নেই! তাতে মিছে জ্বালা মিছে যন্ত্রণা।

কিন্তু এও বোধ হয় ঠিক নয় কারণ যে কোন চরমই অমঙ্গলকর শুধু মাত্র হৃদয়াবেগ যেমন ঠুনকো তেমনি নির্জলা যান্ত্রিকতাও বিপজ্জনক। এবং যেখানে অতিশয্যের আশঙ্কা আছে সেখানে স্থির মস্তিষ্কে অনুধাবনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে খুব বড় ত্রুটিকেও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

আর একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের পরিণতি নির্ভর মননের পরিপক্কতারই ওপর। মনন যেন আগুন এবং আবেগ আগুনের শিখা, যে কোন একটা নিষ্প্রভ হয়ে গেলে শীতলতা অনিবার্য।

যদিও ভেতরে অনেক ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছে তবু অনেকক্ষণ একা একা বারান্দায় পায়চারী করতে করতে এটুকু বুঝলাম ছবির ঘটনাটাকে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার না করলে আমি ভুল করতে পারি। আর সে ভুলের [illegible] হবে মারাত্মক। আমার অতিরিক্ত ভাবালুতার মানেই হবে ওর দুঃখ এবং দুঃখের ভার বেশী হলে একটা কিছু কাণ্ডও করে বসতে পারে।

এটাই সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমি সামান্য আঘাত করলেই এখন সে মুষড়ে পড়বে এবং তাতে আমার মনের ঝাল মিটবে কিন্তু ঐটুকুই আর কোন লাভ নেই। অপর পক্ষে ইচ্ছে করলে আমি এখন ওকে আরো মঞ্জরিত করে তুলতে পারি, করতে পারি আরো সার্থক ও সুন্দর। তার জন্য প্রয়োজন প্রেম এবং ক্ষমা।

'যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি' তারই পুজায় বলি হবার ইচ্ছেটা তো শুধু লাবণ্যের নয় বরং এটা আকাঙ্ক্ষিত জনের কাছে নরনারী-মাত্রেরই দাবি।

এখন আমি ওকে ভালোবেসেছি কিনা এটাই প্রশ্ন। যদি বেসে থাকি তাহলে এতটুকু ক্ষমা করতে পারবো না? বিশেষত এ যখন একটা দুর্ঘটনা মাত্র, যার আবর্তে সে একান্ত অসহায় ছিল?

বিছানায় ফিরে এসে দেখি অকাতরে ঘুমাচ্ছে ছবি. এতদিনকার পুষে রাখা মেঘের ভারটুকু ঝরিয়ে যেন এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু রাতের ঘুমে যা সম্ভব হয়েছে সকালের আলোতেও কি এ অক্ষুন্ন থাকবে? থাকতে পারে, তার একটা মাত্র উপায়। সে হল আমার আনন্দ ও উচ্ছলতা কাল সকালে আমি যদি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারি তখন ওর ওপরে তার যে আভা পড়বে তাতে ওর অন্তর বাহির একটি শিখায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে। শাস্তির বদলে ক্ষমা, সঙ্কীর্ণতার বদলে মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে হবে আরো কৃতজ্ঞ।

সে কি আমি করতে পারি না? কতটুকু আত্মত্যাগের প্রয়োজন তার জন্য? চেষ্টা করে দেখা যাক্।

আঁকার একটা পিরিয়েড পুরো করবার জন্য বাইরে যাব ভাবছিলাম। মুজতবার সঙ্গে কথাও হয়েছে সপ্তাহখানেকের জন্য আমরা যাব চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায়। কিন্তু এখন যাওয়া ঠিক হবে না। এখন সামান্য পিছুটানও ওর মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে।

মুজতবা হয়তো বিদ্রুপ করবে, বৌয়ের আঁচল বুঝি ছাড়াতে পারছিস না? ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ!

কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্যই এটুকু স্বীকার করে নিয়ে প্রোগ্রামের তারিখটা একটু পিছিয়ে দিতে হবেই।

আরো একটা জিনিশ রয়েছে ভাববার মতো। ছবির অবচেতন মনের প্রবল আকুতিটার সমাপ্তি প্রয়োজন। কিন্তু তাকে স্থূলভঙ্গিতে দাবিয়ে দিলে হবে না। সেজন্য মনোবিকলনের আঁকাবাঁকা পথেই অগ্রসর হতে হবে। ডাক্তার নই, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান তো আছে? এইটুকু জানি কামনাকে কামনা পূর্তির মধ্য দিয়েই জয় করা সম্ভব কোলের কাছে নতুন কান্না এলে হারিয়ে যাওয়া কান্নার রেশ আর কখনো বাজবে না।

সকাল বেলায় আমার আনন্দিত কণ্ঠস্বর শুনে ছবি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মুখ ধোওয়ার আগে কাগজ দেখছিলাম। হঠাৎ ডেকে উঠলাম, ছবি! ছবি!

ও উঠে বিছানাপত্র গোছগাছ করছিল। তক্ষুণ এসে বিমর্ষ মুখে জিজ্ঞেস করল, কি!

আমি ওর হাত ধরে টানি। বললাম, দ্যাখ কি অদ্ভুত খবর। আঠারো বৎসরের তরুণীর ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধকে বিবাহ! নারী রহস্যময়ী, তাতে আর সন্দেহ কী!

ছবি অনিচ্ছার সঙ্গেই বলল, সত্যিই অদ্ভুত তো!

হ্যাঁ শোনো! নাড়ুটাড়ু কি আছে দাও তো। আর এক কাপ চা খাওয়াও। আমি একটু বৌদিদের ওখানে যাব।

আমার কথায় সহজ সুর থাকা সত্ত্বেও কেমন সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায় ছবি। বলল, ওখানে কেন?

নোটনকে নিয়ে আসি গে! একলা একলা আর কত ভালো লাগে।

ছবি যেন হঠাৎ জেগে উঠল! জিজ্ঞেস করল, সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

আমি উঠতে উঠতে বললাম, তুমি কেটলিটা চাপিয়ে দাও। আমি এক্ষুণি মুখ ধুয়ে আসছি!

আমি বাথরুমের দিকে পা বাড়ালে ছবি পথ রোধ করে বলল, শোনো!

আমি স্নিগ্ধস্বরে বলি, কি বল?

ছবি ঢোক গিলে বলল ,এতকিছু যে বললাম তুমি কিছু মনে করনি? আমাকে খারাপ ভাবনি?

ও! পাগল! আমি হেসে উঠে বললাম, এতে মনে করার কি আছে! সাধারণ ব্যাপার! কতই ঘটে থাকে! তাছাড়া তোমার তো কোনো দোষ ছিল না! এজন্য তোমাকে খারাপ ভাবব?

আমার গা ছুঁয়ে বল, সত্যি বলছ তুমি? যদি সত্যি না হয় আমি মরে যাব। বল বল আমার গা ছুঁয়ে বল!

আমি ওকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললাম, সত্যি বলছি মনে করিনি। প্রথম ভেবেছিলাম বুঝি ভয়ঙ্কর কিছু, কিন্তু পরে বুঝলাম তোমার আমার ভালোবাসাটাই বড় সত্য!

কথাটা শেষ করার পর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়তে ছবিও সাগ্রহে এগিয়ে এল। কিছুক্ষণ পর মাথাটা আমার বুকে এলিয়ে আস্তে আস্তে বলল, সত্যি আমি ভাগ্যবতী।

দুইফোঁটা পানি বেরিয়ে এসে গালের উপর স্থির হয়ে ছিল, আমি মুছে দিলাম।

মেঘ যখন কেটে গেল আকাশে সূর্য, তারা, চাঁদ, নীহারিকা দেখা দিতে দেরি হল না। কঠিন আঘাতকে ভোলে মানুষ আর যা বিস্মৃতির যোগ্য তাকে আমি ভুলব না? ছবিও সংশয়মুক্ত। তাই কোমল পদ্মের মতো পরতে পরতে সে দল মেলেছে ওর শরীরের বিন্দু বিন্দু অংশ মাতৃত্বের রসে গৌরবান্বিত হয়ে উঠছে ক্রমশ। চাহনি গভীর, হাসি আরো মধুর। সেবায় সুধা-স্পর্শ। [illegible] এনেছিলাম ওকে নিয়ে থাকতে পারে বলে আমার কাজেরও সুযোগ হয়ে গেল।

প্রতিদিনই কিছু কাজ করি কিন্তু উপলব্ধি করি মনের মধ্যে পালাবদল হচ্ছে। এক ঋতু গিয়ে আসছে অন্য ঋতু। এতদিনকার ছবিতে রূপটাই ছিল প্রধান বাইরের চাক্ষুষ মূর্তি কিন্তু তা-তে আর তৃপ্তি পাচ্ছিনা। অন্যপথ দরকার, অন্যভঙ্গি। বস্তুর বাইরের রূপটাই তো চরম সত্য নয়? যদি তাই হয় তাহলে শুধুমাত্র একজনের চেহারা না এঁকে চেহারায় তার আত্মাকে ফুটিয়ে তোলাই আসল কাজ। সমালোচনার বইয়ে পড়েছি বহু এবং সেই মতো চেষ্টাও করেছি কিছু কিছু, পান্নার ছেলে কোলে ছবিকে একদিন আঁকতে চেয়েছিলাম। আঁকতে চেয়েছি কিন্তু তখন উপলব্ধি বদলে ধারণাটাই ছিল জাগ্রত, ভালো আঁকা হত বটে তবে ভালো ছবি হত কিনা সন্দেহ।

এখন আশ্চর্য যা কিছু পরিকল্পনা জাগে মাথায় আত্মার সঙ্গে না মিলিয়ে তাঁকে দেখতেই পারি না।

এতে অবশ্য একটা বিপদ আছে। সে হল অতিমাত্রায় অ্যাবসট্রাকশনের প্রতি ঝোঁক, যার ফল মূল্যবোধের নেতি। আর শিল্পী যদি এমন হয় কামুর চরিত্রের মতো তাঁর নির্বাসনে আর বেরুবার পথ নেই কারণ অতীত মোহ সব নিঃশেষ আর স্বপ্নের দেশ অলীক প্রমাণিতঃ জীবন আর ব্যক্তিত্বে করুণ বিচ্ছেদ, অভিনেতা আর মঞ্চে অসঙ্গতির পরাকাষ্ঠা। জীবনে এই হল সামগ্রিক অর্থহীনতার অনুভূতি। তাহলে সেই

শিল্পীর অস্তিত্বই সংকটাপন্ন। যে আত্নবিচ্ছেদের বন্ধুর যাত্রা তার অপমৃত্য থেকে উত্তরণের পথ তাতে সফল হতে পারে আর কয়জন?

অথচ শিল্পীর জীবনে এমনি ধরনের আত্নিক সংকট অবশ্যম্ভাবী। কারণ সে আর দশ-পাঁচটা লোকের মতো নয়। বরং সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল। সেতারের সূক্ষ্ম তারগুলো বাজছে প্রতি নিয়তই এমন কি হাওয়ার ছোঁয়ায়ও সে স্থির থাকবে কি করে? ভাববেই, কাঁদবেই ভেঙে পড়বেই। আর একমুহূর্তে যে তাকে তুলতে পারে স্নেহশীল পিতার মতো হাত ধরে সে হল আস্থা। প্রতারণাকে বুঝেও বিশ্বাস. ঘৃণাকে নিয়েও প্রেম! মৃত্যুকে বুঝেও মানবতা অধ্যাত্নবাদী না হয়েও শিল্পী বলবেঃ হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং সুখ। তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মীয় দৃষ্টায়ে। যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোহহসাবসৌ পুরুষঃ সোৎ সম্মি!

শিল্পীর কাছে সে সূর্য ছাড়া আর কি? সে যদি আমার কাছে তার আচ্ছাদন ক্ষণিকের জন্য সরিয়ে থাকে তাহলেই তো আমি ভাগ্যবান।

আসলে সংক্ষিপ্ত কোনো রাস্তাই নেই। মহৎ শিল্পী হতে গেলে সে সমস্তই মাড়িয়ে যেতে হবে. মাড়িয়ে যেতে হবে, হঠাৎ খাদে পড়ে গেলে নিমজ্জিত হলেও চলবে না। আগুনকে বুকে নিয়েই হতে হবে খাঁটি সোনা। মনকে বাঁচিয়ে রেখে নিজের মনের ঊর্ধে তাকে উঠতে হবে। কঠিন সাধনা।

এ বয়সে তা পুরাপুরি অর্জন করা অসম্ভব। কারণ এখন আবেগ অতিরিক্ত, বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, প্রজ্ঞা অপূর্ণ এবং অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ। তাই মাস্টারপীস নয় প্রস্তুতিই এখনকার কাজ।

কিছুদিন ধরে একটি ব্যাপার মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না- সে হল নারী জীবনের সার্থকতা কোথায়? ছবির ব্যবহারটাই এ ভাবনার কেন্দ্র, সেজন্য ক্রমেই তা গভীরতা লাভ করেছে। নারীর জীবন কি প্রেম অথবা মাতৃত্ব? প্রেম ছাড়াও মাতৃত্ব সম্ভব; কিন্তু মনে হয় প্রেমের মধ্য দিয়ে যে মাতৃত্ব সেখানেই রয়েছে সত্য কিন্তু পুষ্পের বোঁটায় পরিণত ফলের মতো প্রেমজ সন্তানেই নারী-পুরুষের সম্পর্কের সার্থকতা।

কিন্তু তবু প্রেমহীন ফলের ক্ষেত্রেও মাতৃত্ব অপরাজেয়। আচ্ছা, ছবির সেই অচেতন আকৃতিটিকে রেখার বাঁধনে ধরে রাখা যায়না? আলোর ঝিলিমিলির মতো একটা অস্পষ্ট চিত্র ধারণায় খেলতে থাকে।

বিষয়টা পুরনো। রাফায়েল কার্লো ডলচি মাইকেল এঞ্জেলো পিকাসো ডালি কেউ বাদ দেননি। বক্তব্যের বিশেষ পার্থক্য নেই আছে শুধু আঁকার স্বাতন্ত্র্য। প্রাচীনে ছিল কুমারী জননী ও শিশু এবং আধুনিকে যে কোন অবয়বের কতকটা বিমূর্ত প্রতিরূপ।

চিত্রকলার পিতাদের ছবির সঙ্গে আরো একটি ছবি বাড়ালে আপত্তির তো কিছু নেই ভালো হলে পুনরাবৃত্তি বলে হবে না পরিত্যাজ্য।

কিন্তু এখনই তা আঁকতে পারব না। ছবির কোলে অন্যের শিশু বসিয়ে কাজ করা যেতে পারে না এমন নয় কিন্তু সেটা সত্যিকারের কাজ হবে কি? তাতে আসরে কি

মাতৃত্বের সেই গভীর মোহন রূপ? হয়তো তা নয়। ফুটতে পারে কিন্তু আত্মা জাগবে না এবং আত্মা না জাগলে তার প্রতিচ্ছায়াও পড়বে না মুখের রেখায় রেখায়। অপরপক্ষে নিজের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে যে শিশু তৈরি হচ্ছে যে আসছে অনেক কালের আশা ও স্বপ্নের মতো সে-ই হতে পারে সত্যিকারের প্রেরণা।

ওর বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত এই ছবির কাজ স্থগিত রাখব বলেই ঠিক করলাম।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ আমার থামল না। মাঝে মাঝে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। সেই দৃষ্টি অন্যের কাছে অস্বাভাবিক মনে হওয়াও স্বাভাবিক।

ছবিও একদিন বলল, কি ব্যাপার! এমন করে দেখছ যে আমাকে? যেন অপরিচিতা!

আমি হেসে বললাম, পরিচয় আর কতটা হল ছবি! আরো ভালো করে চিনতে হবে যে। এমনকি সারাজীবনই লাগতে পারে!

আরে বাপস্! দেখি সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাকে নিয়ে এত কি! আমি একটি সাধারণ মেয়ে মাত্র!

সাধারণ বলেই তো অসাধারণ! অসাধারণ যারা অসাধারণ হয়েই শেষ। কিন্তু সাধারণের মধ্যে সারাজগৎ!

ছবি কাছে এসে জড়িয়ে মাথার চুলে আদর করে আমার। গালে গাল চেপে রাখে। বলে, সত্যি তুমি এমনভাবে কথা বলো তা শুনে আমার কান্না আসতে চায়! অনেক দিলে আমাকে অ-নে-ক! প্রতিদানে কিছুই তো দিতে পারিনি আমি!

তুমি আমাকে কি দিয়েছ সে তুমি জানো না। আস্তে আস্তে বললাম, আমার জীবনে তোমার দান অপরিসীম। এবং একথা বলছি তোমাকে খুশি করবার জন্য নয়! এ আমার প্রাণের সংলাপ!

ছবি বলল, সত্যি কি যে হল আমার এক মুহূর্ত তোমাকে না দেখলে ভালো লাগে না. তুমি কাজে যাও, আমি সারাক্ষণ তোমার কথাই ভাবি। কাজ শেষ হয়ে গেলে স্টুডিওতে গিয়ে বসি। তখন আর একলা লাগে না। মনে হয় তুমি ছড়িয়ে আছ সারা ঘরটাতে ! হাত বাড়ালেই যেন তোমাকে পাব! কিন্তু আসলে আমি কি চাই জানো? আমি চাই তুমি খুব বড় শিল্পী হও। দেশ-বিদেশে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ুক। তোমার ছবি বেরুক। জীবনী ছাপানো হোক। তখন আমাকে যদি ছেড়েও যাও দুঃখ করব না।

কপালের ওপরে একগোছা চুল টেনে দিতে দিতে আমি বললাম, পাগলী এমন নাম আমি চাই না। আমি যদি শিল্পী হই তোমার মধ্যে দিয়েই হব। অন্যভাবে নয়, আর পারবোও না

আগেই ভেবে রেখেছিল, হঠাৎ মনে পড়ায় যেন ও বলল, আচ্ছা তুমি না বাইরে যেতে চেয়েছিলে? ঘুরে এসো না কয়দিন?

তুমি তো এক্ষুণি বললে, আমাকে এক মুহূর্ত না দেখে থাকতে পারো না?

বলেছি আর তা মিথ্যে নয়। ছবি বলল, কিন্তু তোমার জন্য আমি সব পারি! তুমি বিশ্বাস কর না?

গভীর আদরে মিশে যাওয়াই এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব আমি তাই করলাম। বড় প্রেম শুধু স্বার্থপর নয় উদারও বটে।

হেমন্তের ছোঁয়া লাগছে আকাশের নীলে গাছপালায় দুর্বাঘাসে, হাওয়ায় হাওয়ায়। ঘরে ফসল উঠল! চড়ুইরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়, তাদের ঠোঁটে কিচির কিচির কলরব। ঘরে যখন নিবিড় আনন্দের অতল ধারা বাইরের আয়োজনে যোগ দিতে আর দেরি করব না। আমি ঘর বাহির যে এক করতে চাই!

✪

শারদীয় ছুটি শেষ হওয়ার পরে কিছুদিন কাজ করেছি কাজেই সাতদিনের ছুটি চাইলে আপত্তি উঠল না। দুতিনটি ছাত্র সঙ্গে আসতে চেয়েছিল তাদের আনিনি। দলের চেয়ে দলের সমস্যাটিই যদি হয়ে যায় বড়ো তাহলে যেজন্য বেরুচ্ছি সে উদ্দেশ্যটাই যাবে পণ্ড হয়ে। এবং সে আমাদের কারুরই কাম্য নয়।

আমি আর মুজতবা যেদিন চাটগাঁ গিয়ে পৌঁছলাম সে ছিল শুক্রবার। সারারাত প্রায় দাঁড়িয়ে থাক'র মতো কাজেই একফোঁটা ঘুম হয়নি। এই শহরে বন্ধু-বান্ধব আছে, গিয়ে উঠলে অনাদর করবে না হয়তো; কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে মাঠে গিয়ে নামাই আমাদের সংকল্প এবং কষ্টের জন্য তৈরি হয়েই এসেছি। লটবহর অতি সংক্ষিপ্ত। জানদুটো আর আঁকার সরঞ্জাম। এ দুয়ের মাঝখানে একটা বড় চৌকোণো ধরনের ক্যানভাসের ব্যাগ। এতে যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী। তিনটে বিস্কুটের প্যাকেট, জেলি, মাখন এবং পাউরুটি। ব্রাশ টুথপেস্ট সাবান তেল আরও যা দরকার এর ভেতরে ছোটো একটা থলির মধ্যে আছে। ফ্লাস্কটা বাইরে আমার কাঁধে ঝুলানো।

মুজতবা আরো এসেছে দুবার। তাছাড়াও, বাইরে ও যে সত্যিই চৌকস করিৎকর্মা লোক তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এসব ব্যাপার আমাকে ভাবতে হয়নি। যোগাড় যন্ত্র সমস্ত ওর। আমি যেন শুধু অনুগ্রহ করে এসেছি ওর সঙ্গে।

রেস্টুরেন্টে পেট পুরে পরটা গোশত খেয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, মুজতবা বুঝতে পেরে আগেই বলে ফেলল, কিছু ভাবিসনে কেবল আমার সঙ্গে আয়!

রিক্‌শা করে ও আমাকে যেখানে নিয়ে এল সে জাহাজ ঘাট। একটু পরেই লঞ্চ ছাড়বে। লোকজন সব উঠে পড়েছে। যাত্রার আগে সারেং কষে ভেঁপু বাজাচ্ছিল, এটা লোক ছুটিয়ে আনার কায়দা। স্টিমে চললে কি হবে এও কেরায়া নৌকা বৈ তো নয়! খ্যাপ পোষানো চাই।

আমরা দু'জন পিছিয়ে পড়ার দলে কিন্তু মুজতবা তবু যাচ্ছে গদাই লস্করী চালে, কোন তাড়া নেই। আমি বললাম, আর একটু তাড়াতাড়ি যাওনা। লঞ্চ ছেড়ে দেবে।

ছাড়বে না, ও নিরুদ্বিগ্নস্বরে বলল, আরো অন্ততঃ আধঘন্টা দেরি!

ও এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, কাজেই আর উচ্চবাচ্য করা অনুচিত। আমি চুপ মেরে গেলাম।

সাম্পান ভাড়া, জাহাজ পর্যন্ত গেলে ও দুটি আনি বাতার ওপরে রেখে দিল মাঝি পয়সাগুলো দেখেই কাইকাই করতে থাকে বলে আট আনার এক পয়সা কমও নেবে না। কিন্তু ও নির্বিকার। জিনিশপত্রগুলো রেখে আরেকটি দু'আনি ছুঁড়ে মারলো, বলল ওড়া! এ তরে বখশিস দিলাম।

মাঝি রাগ চাপতে চাপতে সাম্পান ঘোরায়। মুজতবা বলল, এরা এমনি। দু'জনের একআনা হল আসল ভাড়া। কিন্তু বাইরের লোক ভেবেছে ব্যস যত পারো আদায় করো। বড় বাজে!

লঞ্চ ছাড়ল আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। কড়া রোদ ছিল না। আমরা ছাদের ওপর গিয়ে বসে সিগারেট ধরাই। দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে বেগুনী মেঘের মতো।

আর নীচে দুই তীরে সবুজের পোচ নিয়ে ঘুরে বেঁকে চলে এসেছে নদীটি নাম যার কর্ণফুলী, পাহাড়ী মেয়েরেই মতো পায়ে নুপুর।

প্রকৃতির পটে আঁকা বিধাতা শিল্পীর আশ্চর্য চিত্র, ওর তুলনা কোথায়? বাইরে ছবি, ভেতরে গান এবং এই তো জগৎ। মুজতবা একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। সে বরাবর গম্ভীর হয়েই আছে। বলল, চেয়ে দ্যাখ্ জাহেদ! বেশ লাগছে, আঁকবি নাকি?

হ্যাঁ আঁকলে হয়, রং তুলি নিয়ে আসি। আমি উঠে নীচে নেমে এলাম। আর একটু দেরি না করে সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে আবার ওপরে উঠি।

রং গুলে নিয়ে দু জনেই কাজ করছি, ওয়াটারকালার। ও আঁকছে দিগন্তরেখা আর নদী, আমি একজোট নৌকা।

আঁকছি বটে তবে খুব একটা উৎসাহ নেই। ল্যাণ্ডসকেপ আমার ভালোই হত কয়েকটি কাজ বহুল প্রশংসিত হয়েছে কিন্তু সেগুলোও যেন আনাড়ির চিত্রচর্চা। কাঁচা রং নিয়ে খেলা! কেন জানি এসব আর ভালো লাগে না, ভালো লাগে না মোটেই। মানববিরহিত প্রকৃতি যেন অর্থহীন অনাবশ্যক। শিল্পের বিষয় হিসেবে আমি মানুষকে চাই, কেবল মানুষ। পাহাড়কে আমি পছন্দ করি! কিন্তু শুধু পাহাড়ের দৃশ্যচিত্র আঁকার কি সার্থকতা আছে বুঝিনা সেজন্য গোড়া থেকেই আমার লক্ষ্য পাহাড়ী মানুষ গগাঁর মতো পলায়ন নয় কিন্তু তাহিতি আমার চাই আদিম তাহিতি।

ব্রাশে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে জিনিশ গুটিয়ে ফেলি। মুজতবা জিজ্ঞেস করল, কিরে শেষ হয়ে গেল?

হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত জবাবটুকুর পরে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরালাম। রঙের হিজিবিজি রেখায় ভরে গেছে ওর কাগজটা, খুব একটা ইচ্ছা নিয়ে যেন আঁকছে না ও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, চন্দ্রঘোনায় পৌঁছতে একটা বাজবে?

লঞ্চ এইভাবে চলতে থাকলে দেড়টা দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই।

আচ্ছা মগদের বাজার বসবে বলছিলে না তুমি? ঠিকই বসবে তো?

হ্যাঁ আজ শুক্রবার নিশ্চয়ই বসবে। তোর খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?

তা বৈকি। এজন্যই তো এলাম আমি, আবার ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বাইরের লোকদের ওরা কি চোখে দেখে?

যা স্বাভাবিক ঠিক সেই চোখে। খুব অতিথিপরায়ণ ওরা যদিও মগের মুল্লুক বলে প্রবাদ আছে, কিছুকাল আগেও যে কেউ গেলে খুব খাতির করত। কিন্তু আজকাল এতটা করে না। বেশি মাখামাখি করতে গেলেই সন্দেহের চোখে দেখে। বাইরের লোক গিয়ে ওদের বহু মেয়েছেলে নষ্ট করেছে কিনা?

কথাটা বলার পর ওকি যেন ভাবে, আমিও চুপ হয়ে থাকি। তাহলে পাহাড়ে বাস করলেও আদিম ওরা নয়। সভ্যতার আলোও পাচ্ছে প্রতিনিয়তই, আর এখন যখন এলাকাটাই কলের হুস্‌হুস্ আর ক্যাটারপিলারের চিৎকারে মুখরিত তখন আরো আলো পাবে বৈকি! কিন্তু না, বিচার করলে দেখা যাবে বর্বরযুগে বাস করবার চেয়ে সেও ভালো।

লঞ্চ চন্দ্রঘোনায় এসে পৌঁছল ঠিক পৌনে দুটোয়। পাড়ের দিকে ভিড়লে কিছু লোক সাম্পানে উঠে নেমে গেল, কিন্তু রইল বেশির ভাগ। তারা কাপ্তাইয়ের যাত্রী। আমি চেয়েছিলাম পেপারমিলের দিকে; পাহাড়ের বুনো এলাকায় সিংহ ব্যাঘ্রের বদলে আজ

যন্ত্রের গর্জন। প্রচণ্ড শব্দে বাঁশ কাটা পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এদিকে একটা পাইপ দিয়ে ব্যবহৃত ময়লা পানি পড়ছে সরসর ধারায় আর তারই রাসায়নিক অংশ শাদা ফেনা ভাসছে নদীর বুকে।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি, মুজতবা জিজ্ঞেস করল, মিলে নামবি নাকি?

আমি আর কি বলবো। তুমি যা ভালো মনে করো।

দেখতে দেখতে কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবে। বাজার ভাঙে তার আগেই। এক সপ্তাহের আগে আর দেখতে পাবি না।

আমি বললাম, তাহলে থাক্ বাজারটাই দেখি। অন্যদিন সুযোগ করে মিলটা দেখে নেব।

ঠিক আছে তবে তাই হোক। একটি সাম্পান ভিড়েছিল আমরা জিনিশপত্র নিয়ে তাতে উঠে পড়ি।

ওপারে নদীর ধারেই মগবাজার। সকাল থেকেই লক্ষ্য করছি মুজতবার মুখটাকে দেখাচ্ছে বেশ কালো আর বিমর্ষ, কথা বলছে ঠিকই কাজও করছে কিন্তু ভেতরে যেন অন্য চিন্তা! তিক্ত কিছু গভীর কিছু। সাম্পানের পেছনদিকে বসে এখনো সে মাথাটা নীচু করে আছে।

কাছাকাছিই বসেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার হে! রাধারাণীর সঙ্গে ঝগড়া করে এলে নাকি?

আরে হোঃ রাধারাণী! মুজতবা চরম তাচ্ছিল্যভরে একটা মুখভঙ্গি করে চুপ মেরে গেল। মাথা একটু তুলে বলল, জানিস্ জাহেদ জীবনটাকে আমার মনে হয় একেবারে অর্থহীন এ্যাবসার্ড। ইটস এ টেল টোল্ড বাই এ্যান ইডিয়ট ফুল অব সাউণ্ড এ্যাণ্ড ফিউরি এ্যাণ্ড সিগনিফায়িং নাথিং!

হঠা—ৎ! আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাই।

হঠাৎ নয়! এটাই আমার বরাবরের মনোভাব। গোটা জিনিশটাই যখন নিরর্থক তখন একে নিয়ে এতো ভাববার কি আছে। যা হবার হবে। ভালোভাবেই হোক আর মন্দভাবেই হোক গন্তব্য সেই একই ধ্বংস মৃত্যু বিলুপ্তি!

এযে দেখছি অন্যরূপ, অথবা এই সর্বাত্মক আস্থাহীনতাই কি ওর উচ্ছৃঙখল জীবনযাত্রার উৎস?

কিন্তু মাথায় রোদ, এখন কিছু চিন্তা করবার সময় নয়; সাম্পানটা পাড়ে এসে লাগলে আমরা উঠে পড়ি। আড়াইটে বাজছে, খাওয়া দাওয়া শেষ? এখন ছবি বিছানায় কাত হয়ে নিশ্চয়ই ভাবছে আমার কথা। আরে হ্যাঁ ও বারবার মিনতি করে বলেছিল পৌঁছেই একটা চিঠি দিতে, চট্টগ্রামে সেকথা মনেই হয়নি। এখান থেকে লিখতে হবে। ও আদর করতে করতে আরো বলেছিল ঠিক সময়ে খেয়ো ঠিক সময়ে ঘুমিও যেন। শরীরটা একটু এদিক- সেদিক হলে দেখা যাবে!

আমার শরীরটা ছবির সম্পত্তি এবং যতটুকু তার জৌলুস তা গত কয় মাসে ওরই হাতে গড়া। কাজেই বললাম তোমার জিনিশ আমি নষ্ট করবো পাগল!

কিন্তু ওটা ছিল কথার কথামাত্র। কারণ শুধু আমি নয় ও নিজেও জানত যে-কাজে বেরুচ্ছি তাতে সময়ানুবর্তিতা অসম্ভব।

ওপরে উঠতেই দেখি ছোট্ট বাজার। একধারে দাঁড়ালে অন্য প্রান্তটুকু পর্যন্ত দেখা যায় । বাঁশের চালাঘর আছে কয়েকটা, মাঝখানে একটি বটগাছ। পুরোপুরি বিকেল হয়নি তবু জায়গাটা লোকজনে ঠাসা। পরে জানতে পেরেছি সকাল থেকেই বাজার বসে এবং সন্ধ্যার ঘন্টা খানেক আগে শেষ হয়ে যায়। এরপরে যারা থাকে তারা একান্ত কাছের বাসিন্দা। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি। রোজকার দরকারী জিনিশপত্র। ধানচাল তরিতরকারী তাঁতেবোনা কাপড়চোপড় এলুমিনিয়ামের তৈরি সস্তা অলঙ্কার। পাইপ তামাক বাঁশের চোঙের দই চুরুট কিন্তু নতুন যা চোখ পড়লে সে হল পুরুষের চাইতে মেয়ের সংখ্যা কম নয়। পরনে নকশি কাজ করা শাড়ি বুকে বাঁধা একখণ্ড চিত্রিত কাপড় গোলগাল স্বাস্থ্যবান চেহারার তরুণীরাও নিরুদ্বেগে জিনিশ নিয়ে বসে আছে। কেউ কেউ কিনছে জিনিশ। পাঁচ ছমাইল দূর থেকে যারা আসে তারা বেচাকেনা করার পর বাঁশের ঝাঁপিটা পিঠে বেঁধে ফিরে চলেছে।

বটগাছের একটা শিকড়ের কাছে তিনটে মেয়ে বসে ছিল। এদের একটি বেশ সুন্দরী। কাটা চেহারা। ওদের সামনে হাতের তৈরি চুরুট।

মুজতবা কাছে গিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে আধা চাটগাঁই আধা হিন্দী ভাষায় আলাপ শুরু করে। ওরা সব বুঝেছে এমন নয় তবু উত্তরও দিচ্ছে। প্রত্যেকের মুখেই নিরীহ সরল হাসি।

মুজতবা তুলি কাগজ দেখিয়ে ওর অদ্ভুত ভাষায় জিজ্ঞেস করল, ছবি আঁকলে ওদের আপত্তি আছে কিনা। সেজন্য রুপেয়া বখশিস দিলেও সে রাজী।

তিনজনের মধ্যে সবার বড় গোলগাল মেয়েটি আভাস ইঙ্গিতে জবাব দিল, এখানে সম্ভব নয় বাড়িতে গেলে রাজী হতে পারে।

ওরা যখন আলাপ করছিল আমি মুখ তুলতেই দেখি লুঙিপরা গায়ে জামা মাঝবয়েসী একটা মগ কিছুদূরে দাঁড়িয়ে বুলডগের মতো তাকিয়ে আছে। সে কে? এমন ভাব কেন? ছোট ছোট চোখ যেন জ্বলছে একেকবার। ভাবি এমনভাবে আলাপ করছে বলেই হয়তো! মুজতবাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম, এই! আর কত ওঠ না?

কেন হয়েছে কি? বলে মুখটা তুলতেই ওর দৃষ্টিও পড়ল গিয়ে লোকটার দিকে। এবারে লোকটার ঠোটমুখ কাঁপছে যেন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে! মুজতবার চেহারা নিমেষে ছাইবর্ণ। সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল, চল্।

সবজীবাহী তিনমাঝির একটি লম্বাটে নৌকো কাপ্তাই যাচ্ছিল, এক কথায় দুটাকায় রফা করে উঠে পড়া গেল। নৌকো দুইদাঁড়ের টানে এগিয়ে চলেছে। নদীর দুই পাড়ে ঝোপঝাড় কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল নেই। আমি ভাবছিলাম অন্য বিষয়। ব্যাপারটা কেমন রহস্যময় ঠেকছে। যতক্ষণ না নৌকোটা ঝাপসা হয়ে আসে ততক্ষণ নড়েনি। মুজতবাকে একবার মাত্র জিজ্ঞেস করলাম, কিহে কি ব্যাপার!

সে অন্যমনস্কভাবে বলল, কিছুনা, ছাইলাউংফা মগ!

আমি আরো কিছু জানতে চাইলাম কিন্তু ওর চেহারা দেখে দমে যাই। কেমন কঠিন আর কালো। সে আমার পরিচিত সঙ্গীটি যেন নয়।

কাপ্তাই খালের কাছাকাছি বনবিভাগের বাংলোতে যখন এসে পৌছি তখন সন্ধ্যে হওয়ার সামান্য বাকী। একটা ঘরে জিনিশপত্রগুলো রাখার পর মুজতবা চৌকিতে শুয়ে

পড়ল। আমিও একটা ইজিচেয়ারে কাত হলাম। সকাল থেকে এতটুকু বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যায়নি।

কাছেই কোথায় ছিল নিম দাড়িওলা বাবুর্চি মাজু মিঞা, এসেই আবাক হয়ে গেল, স্যারে যে! কখন আইলেন?

মুজতবা মাথাটা একটু তুলে জিজ্ঞেস করল, এই তো এক্ষুণি! তোমার সায়েব কোথায়?

জঙ্গলে গেছেন! মাজু মিঞা বলল, আওনের সময় অইছে।

ভালো আছ তো সব? এবার সে উঠে বসে পকেট থেকে প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট ধরালো।

সিগারেটটা পুড়ে অর্ধেক না হতেই শাহাদাতের গলা শোনা গেল। তার পায়ে বুট পরনে হাফপ্যান্ট কাঁধে বন্দুক এবং সামনে পিওন পেছনে দারোয়ান। বেঁটে খাটো ছেলেটি কিন্তু নাকি দাপট প্রচণ্ড। সহকারী বন অফিসার হলেও কি হবে এই জবরদস্ত লোকগুলোও বড় অফিসারের চেয়ে তাকেই ভয় করে বেশী, প্রায় যমের মতো।

শাহাদাৎ বাংলোতে ঢুকে মুজতবাকে দেখেই বলল, এলেই শেষ পর্যন্ত। বেশ, ইট্‌স ওক্যা। আমার ঝক্কি একটু বাড়লো আর কি। তুমি আবার কিছু মনে করোনা জাহেদ, একটা পার্সোনাল ব্যাপার আছে। মাজু! মাজু!

চিলের ডাকের মতো সাহেবের চিৎকার শুনে মাজু মিঞা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। বলল, জি সাব।

তোমার বাজার-সওদা ঠিক আছে তো? দুই সাহেব এসেছেন।

সব আছে, স্যার। তবে কিছু হলদি গরম মশলা আর পান সুপারি আনতে অইব। আজগা মুর্গিডাই ধইরা ফালাই।

মাজু মিঞাকে বিদায় দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে শাহাদাৎ জিজ্ঞেস করল, তারপর? তোমার খবর কি, জাহেদ? শুনলাম বিয়ে করেছ!

আমার বিয়ের খবর এই জঙ্গলে পর্যন্ত এসে গেছে! আশ্চর্য।

আশ্চর্য কিছু নয়, তোমরা হলে গিয়ে এখন বিখ্যাত লোক।

ঢাকায় গিয়েছিলে নাকি?

আরে না গেলেও সব খবর পাই। এই শ্রীমানই লিখেছিল। বলে মুজতবার দিকে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা নির্দেশ করল।

দু'বছর আগে মুজতবা একবার এসে এখানে মাসখানেক কাটিয়ে গেছে জানি; কিন্তুই তবু এমন বিমর্ষ হয়ে থাকার কোন মানে বুঝতে পারছি না। সে চুপচাপ ধূমপান করছে।

গত রাতটা কেটেছে ট্রেনে কাজেই কিছু ঢুলেছি শুধু, ঘুমাতে পারিনি। দিনের বেলাতেও তা পুষিয়ে নেবার সুযোগ ছিলো না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগেই চোখ জড়িয়ে আসছিল; কিন্তু ক্ষিদের মার ভয়ানক। ভালো রান্না, গলা ইস্তক পুরে নেওয়া গেল। বারান্দায় ওদের সঙ্গে বসে একটা সিগারেট শেষ করার পর চলে এলাম বিছানায়।

কিন্তু বসেই থাকে ওরা দু'জন। পাহাড়ী রাত, কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচাঁদ শালবনের ওপরে দেখা দেয় শেষরাত্রে; কিন্তু এখন অন্ধকার। বাংলোর আশেপাশে পোকা-মাকড়ের

রিন্‌রিন্ ঝিন্‌ঝিন্ একটানা সঙ্গীত এবং মগপল্লীতে মাঝে মাঝে কুকুরের ঘেউঘেউ, এছাড়া আর বিশেষ কোনো শব্দ নেই।

আমার চৌকিটা জানালার সঙ্গেই, কাজেই ওদের দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছি আবছা-মতো। দু'টি সিগারেটের দুই বিন্দু আগুন। দু'জনেই নীরব রইল খানিকক্ষণ। এরপর শাহাদাৎ নীচুস্বরে বলল, এত করে মানা করলাম, তুই না এলেই পারতিস্ মুজতবা। এখানে তো তোর নতুন কিছু করার নেই। যা হবার হয়ে গেছে, আবার ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি।

আমি চোখ বুঁজে আছি কিন্তু কানখাড়া। মুজতবা বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। পরে বলল, লাভ-লোকসান আমি বুঝি না। কেবল না এসে ভালো লাগছিল না একথা ঠিক। বিপদ আর কি হবে, মৃত্যুর ওপরে তো কিছু নেই? জীবন আর মৃত্যু আমার কাছে সমান। আর জীবনকে দেখার জন্য যে মৃত্যু তা'তো অভিনন্দনযোগ্য।

বড় কথা রাখ্। তুই যা' করেছিস্ তা কিন্তু কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। আমি হলে তো গুলী করে মারতাম। ছাইলাউংফা তোকে খুঁজছে নানান জায়গায়, এখানেও এসেছে কয়েকদিন। পেয়ে গেলে প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। জংলী মানুষ, খুব সাংঘাতিক, ক্ষেপলে খতম না করে শান্ত হয় না। বিশেষ এখানে জীবন নিয়ে খেলা। ওর একমাত্র মেয়ে তিনা, তা'কে তুই নষ্ট করেছিস্।

আমি তো নষ্ট করিনি? সে তো ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছিল।

হ্যাঁ। কিন্তু ওরা ইচ্ছে করে ধরা দেয় কখন? যখন একজনকে ভালোবাসে। তার মানে হল, চুংমুংলে'র সুমুখে এক শুকর তিন মুর্গী বলি না দিলেও সে তাকে স্বামী হিসাবেই ভাবে। কিন্তু তুই তো পালিয়ে গেলি? এ নিছক ধাপ্পা। তিনা তোকে মনপ্রাণদিয়েই ভালোবেসেছিল, তাই বদ্ধপাগল হয়ে গেল। এ অঞ্চলের কে না জানে। মহা কেলেঙ্কারী। আধ পাগল অবস্থায় ছেলে হল ওর এবং যে ক'দিন শিশুটি জীবিত ছিল একদম ভালো। ও যেন সব ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু একদিনের জ্বরে ছেলেটা মারা যাওয়ার পর থেকে এখন বদ্ধ পাগল। গুনগুন্ করে গান গায় আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কয়দিন রাত্রে এখানে এসেছে। টিলছুঁড়ে বড্ড উৎপাত করে।

আবার অনেকক্ষণ জনেই চুপ। এক সময় বহুদূর থেকে যেন মুজতবার ম্লানস্বর বেরিয়ে এল, অনেক খারাপ কাজ করেছি; কিন্তু এভাবে কোথাও ধরা পড়িনি।

ধরা লোকে একবারই পড়ে তাই হয়তো! ঠিক আছে, একটু সাবধানে থাকতে হবে আর কি! চল্, শুয়ে পড়া যাক! শাহাদাৎ উঠতেই শোনে গেটে কিচ্‌কিচ্ করে একটা শব্দ হল, ছায়ামূর্তির মতো একটা লোক ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ তির্যকস্বরে প্রশ্ন করে উঠল, কে? কে ওখানে?

মুজতবা বলল, ব্যাপার কি!

সেদিকে কান না দিয়ে শাহাদাৎ ডাকল, সালামত! সালামত! আমার বন্দুকটা নিয়ে আয় জলদি!

আমি উঠে কখন বরান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি বলতে পাবো না। বন্দুকের কথা শোনামাত্র আবার কিচ্‌কিচ্ শব্দ। এবার দ্রুত। আমরা দেখি একটা লোক সত্যি বাইরে বেরিয়ে গেল। বন্দুক আর টর্চ নিয়ে এসে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও আর পাত্তা মিললো না তার।

আমার হৃৎপিণ্ডটা ঢিব্‌ঢিব্‌ করছে! এই নির্জন এলাকায় সবকিছুই ঘটা সম্ভব।

মুজতবা আস্তে আস্তে বলল, আমার মনে হয় ছাইলাউংফা। আসবার সময় মগবাজারে আমাদের দেখছিল!

তাই নাকি? শাহাদাৎ বলল, তাহলে সত্যি বিপদ।

এত ভয় পাবার কি আছে! বেশী বাড়াবাড়ি করলে জানটা হারাবে। মুজতবার কণ্ঠস্বরে একটা অশ্লীল হিংস্র উল্লাসের রেশ। সবদিক ভেবেচিন্তেই সে এখানে এসেছে।

রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা করা হল! খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকায় আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঈষৎ কুয়াশার আমেজ, সকালটা সত্যই মধুর। সালামত বলল ছায়ামূর্তির মতো একটা লোক দুতিনবার প্রাঙ্গনে ঢুকবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বন্দুকের নাল দেখে সাহস পায়নি. চা খাওয়ার পর মুজতবা বলল, চল্‌ বেরিয়ে পড়ি!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়?

মগপল্লীর দিকে। কাজ করতে এসেছি বসে থাকার জন্য নয়। ওর চেহারায় এমন দৃঢ়তা আমি না গেলে একাই যাবে। অগত্যা তৈরি হলাম।

নদীর পাড়ে ঘেঁষে নতুন শালবন এরপরে জঙ্গল এবং তার কাছাকাছি দিয়ে ছোট পাহাড়মালা। সীতাপাহাড়ের শাখাপ্রশাখা। পাহাড়ের ঢালুতে একটা মগপল্লী। আশেপাশে জমিজিরাত কিছু আছে। বাড়িতে লাউ মাচান কলাবাগান। জুমিয়া মগেরা থাকে পাহাড়ের ওপরে মাচানের মতো উঁচু করে বাঁধা বাঁশের ঘরে কিন্তু সমতলে এরা জুমিয়া নয় দেশী লোকদের মতোই তাদের গিরস্তি ও ঘরসংসার। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি এখানেও কোনো কোনো ঘর মাচানের মতো বাঁধা।

প্রকৃতি ও মানুষ সবকিছু ভাল লাগলেও একটা বিষয়ে আমার কৌতূহল বিশেষ জাগ্রত ছিল। তাই জিজ্ঞেস করলাম, তিনাদের বাড়ি কোথায়?

মুজতবা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সংক্ষিপ্তভাবে জানাল, এখানে নয়।

আর কিছু বলল না যেন এ ব্যাপারে আর কিছু জানবার অধিকার আমার নেই।

একটা বাড়ির উঠানে পা দিতেই কুকুর ঘেউঘেউ করে ওঠে। একটা লোক বাইরে এল। তার পেছনে দুটি মেয়ে এবং ন্যাংটা বাচ্চা কয়েকটি। মুজতবা কাছে গিয়ে গেলাস ধরার ভঙ্গিতে হাতটা মুখের কাছে নিয়ে পানি চায়। লোকটা হাসল। এপর দুটো পিঁড়ি পেতে দিল বারান্দায়। আমরা পরপর পানি খেলাম। কাছে ঠকর ঠকর আওয়াজ হচ্ছিল, গলা বাড়িয়ে দেখি কয়েকটি মেয়ে তাঁতে কাপড় বোনায় ব্যস্ত। উঠতে গেলে কলাবাগানের পথে কলসীকাঁখে এল আরেকটি ডাগর কিশোরী।

এক বাড়িতে বসেই পাহাড়ের টিপিকাল জীবনের অনেকগুলো স্কেচ করে ফেললাম। ছবি দেখে ওদের কি স্ফূর্তি! চাইতেই নাপপি এনে দিল। নাকের কাছে নেওয়া যায় না-ওয়াক থো সে কি দুর্গন্ধ! এটা ওদের প্রিয় খাবার!

কেউ বর্ণনা না করলেও ছবি আঁকতে আঁকতে আমার কল্পনায় ভাসছিল তিনার চেহারা। ঐ যে তাঁত বুনছে তারই মতো মিষ্টি মুখখানি। অষ্টাদশী যুবতী কিন্তু চোখমুখ এখন উদ্‌ভ্রান্ত, হাহা করে হাসছে শুধু।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষে বারান্দায় বসেছিলাম আমরা। আকাশে তারার ঝলক। নদীর ওপারে তেমনি অন্ধকার, আশেপাশে তেমনি আবছায়া। সিগারেট টানছি কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। হঠাৎ একটা ঢিল এসে পড়ল পাকার ওপর, ভাঙা ইটের ঢিল,

বেশ বড়ো। আমরা চমকে উঠে দাঁড়াই। শাহাদৎ তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞেস করে উঠল, কে? কে ওখানে? সালামত! বন্দুক লে আও। জলদি!

সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের ঝাড় সশব্দে ভেঙে পড়ার মতো নারীকণ্ঠের একটা অট্টহাস্য হা হা হা হা , হি হি হি হি । শাহাদৎ বলল, এই যে তিনা।

তিনা! বিকারগ্রস্তের মতো উচ্চারণ করল মুজতবা।

শাহাদাৎ জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, তিনা নিশ্চয়ই তিনা!

এবং তৎক্ষণাৎ বারান্দা থেকে একলাফে নেমে পড়ল মুজতবা। তিনার অট্টহাস্য দূরে সরে যাচ্ছিল, দুপ্‌দুপ্ পায়ে সে ছুটছে। খটাস্ করে গেটটা খুলে বেরিয়ে গেল। কি ঘটে যাচ্ছে একমুহূর্ত আমরা বিভ্রান্ত হতবাক্। পর মুহূর্তে ঘোর কাটলে আমি বলে উঠলাম, সর্বনাশ মুজতাবা যাচ্ছে! ও বিপদে পড়বে! চল আমরা যাই পিছু পিছু! দেরি করো না চল!

উত্তেজনায় কাঁপছিলাম কিন্তু শাহাদৎ নির্বিকার আমাকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত গম্ভীর স্বরে বলল, দরকার নেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দে!

তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি নিঝঝুম আকাশের তলে রাতের অন্ধকারে অরণ্যে নদীতে পাহাড়ে পাহাড়ে একটা ডাক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে যাচ্ছে, তি—না!

কত রাত হল?করাচীর লাল নীল সবুজ আলোকমালা ঝিমিয়ে এসেছে আর আমি জেগে আছি? আমি কি মাতাল হয়ে গেলাম?

না, মাতাল হইনি, তবে নেশাগ্রস্ত আছি বৈকি। এ নেশা এক অদ্ভুত নেশা, সব ভুলিয়ে রাখে। সত্তাকে ডুবিয়ে দেয়, ঢেকে রাখে তার মায়াবী আচ্ছাদনে তিনবন্ধু রাতের অভিসার থেকে ফিরেছে কিনা জানিনে, জানবার ইচ্ছেও নেই। ইতিমধ্যে যদি এসেও থাকে সকাল আটটা ন'টা অবধি ঘুমাবে সে এক ভালোই। যে কোনো রকম ধাক্কাকে এড়িয়ে যাব্যর সুবিধে।

কিন্তু বাকী রাতটুকু আমিও যে দু চোখের পাতা এক করতে পারব না মেঘের আবরণ ছিন্ন হয়েছে কিন্তু কুয়াশা এখনো কাটেনি। ছবি আর তিনা এক ছবিরই দুই রূপ একই শিল্পীর আঁকা, তাই শিল্পী মুজতবার ভারত ভ্রমণ হয়তো বৃথা যাবে না. সেদিন রাতেও আমার তাই মনে হয়েছিল। তাই হয়তো স্বপ্ন দেখেছিলাম, পাহাড়ের ওপর থেকে হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে কে আমাকে ডাকছে, হোঁচট খেয়ে খেয়ে প্রাণপণে উপরে উঠছি কাছাকাছি গিয়ে দেখি ছবিঃ ও হাত বাড়িয়ে দিল আমি ধরতে যাচ্ছি এমন সময় প পিছলে পড়ে গেলাম একেবারে গভীর খাদে। চিৎকার করে জেগে উঠেছিলাম, সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা। একটা গোপন ভয় এসে মনে বাসা বাঁধল। এতে কাছে পেয়ে এমনি করেই তো আমরা হারাই?

এখানকার কাজ সেরে রাঙামাটি যাওয়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু সব বাতিল করে দুদিন পরে আমি চলে এসেছিলাম।

ছবি আমাকে নিদিষ্ট সময়ের আগেই দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিল। কিন্তু আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে বুকে চেপে বললাম, তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি তাই ছুটে এলাম। তোমার কিছু হয়নি তো?

না না ওগো কিছ্ছু হয়নি, তোমার কথাই ভাবি শুধু, কিছু হবে কেন?

এবারও করাচীতে সাতদিন থাকার কথা কিন্তু চারদিনের দিন ফিরে গেলেও ছবি এবারে বিস্মিত হবে না। বরং বলবে এ—তো দি—ন! বড় শহরে গিয়ে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে বুঝি? এত দেরি হল!

দেরি হল কোথায়? সাতদিন থাকার কথা ছিল, চারদিনে ফিরে এলাম!

চারদিন না ছাই, চার বচ্ছর বল! ছবির যুক্তির সঙ্গে সত্যি পেরে ওঠা দায়।

সকালে এয়ার অফিসে গিয়ে ভাগ্যক্রমে একটা টিকিট পেয়ে গেলাম। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ফ্লাইট এরই মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়া প্রয়োজন। ওখান থেকেই বাজারে গিয়ে কিছু ফলমূল কিনি। ভালো কিছু নেই। মালক্কাই নিতে হল বেশী। টুলটুলের জন্যে একটা খেলনা উড়োজাহাজ ও কিছু গরম জামাকাপড় কিনলাম। কিন্তু ছবির জন্য নেব কি? ও কিছু বলেনি। বলেছিল তুমি শুধু ফিরে এসো ব্যস আর কিছু চাই না।

কিন্তু আমি দোকানে গিয়ে ওর জন্যে একটা সুন্দর কাশ্মীরী চাদর একটা হাল্কা নীল নাইলনের শাড়ি ও ব্লাউজের কাপড় কিনে ফেললাম। এসব দেখে জানি প্রথমে ও তিরস্কার করবে কিন্তু সে আর কতক্ষণ! প্রত্যেকটাই মনোমত জিনিশ, তাই একটু পরেই ফুটবে ঠোঁটে ভুবন-ভোলানো মধুর হাসি।

এটাই আমি চেয়েছিলাম, এখনো তাই চাই! টুলুটুলের জন্মের আগে ও কেমন কাঠির মতো হয়ে গিয়েছিল, হাসতে পারত না। কিন্তু আনন্দিত দেখলে আমি খুশি হই বলে জোর করে হাসত। একদিন আমার বুকে মাথা রেখে শুয়ে বলল, জানো মেয়েরা কিসে ভাগ্যবতী?

না তো? এমনভাবে বললাম যেন কিচ্ছুই জানি না।

ভাগ্যবতী মেয়েরা স্বামীর আগে মরে এবং স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরে!

আজ হঠাৎ এসব কথা কেন তুমি বলছো ছবি!

ছবি বুকের ওপরেই কাত হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, আমার বড্ড ভয় হচ্ছে, এবার বাঁচবো না! কিন্তু মরতে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ তোমার বুকে এমনিভাবে মাথা রেখেই মরতে পারবো তো!

আমি ওর মাথার একগোছা চুল নিয়ে বলি, ছিঃ ছবি। এমন কথা বলতে নেই। আমি দুঃখ পাই!

জানো দুঃখ পাওয়া তোমার দরকার। বড় আঘাতে না পেলে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। আমি মরে গেলে তুমি সেই আঘাতে পেতে পারো। তখন কত বড় শিল্পী হবে তুমি, সেই খুশিতে আমার কবরে ফুল ফুটবে। ছবি একটু নীরব থাকার পর বলেছিল, কিন্তু আমি বোধ হয় মরতে পারবনা, সে যে ডাকে এখনো! আজ দুপুরে জানো কি হয়েছে শুনি স্টুডিওতে শিশুর কান্না দৌড়ে গিয়ে দেখি কেউ নেই মিনিটা মিউমিউ করছে।

আমি গভীর আদরের সঙ্গে হাত দিয়ে ওর মুখটা মুছে দিতে দিতে বললাম, সে যখন কোলে আসবে তখন দেখো সব ঠিক হয়ে গেছে! ভাবনার কিচ্ছু নেই!

আমি মিথ্যে বলিনি। টুলটুলকে কোলে পেয়ে ছবি আত্মহারা। ভাবটা হারাই হারাই ভয়ে গো তাই বুকে চেপে রাখতে চাই কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে!

তাই বসুন্ধরার জন্যে বিশেষভাবে সিটিং দেওয়াতে হয়নি। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমার সত্তায় যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেই তো প্রতিকৃতি!

জিনিশপত্রগুলো হোটেলে রেখে একজিবিশনে গেলাম। দুপুরে দর্শকের ভীড় নেই কিন্তু বন্ধুদের আড্ডা জমজমাট। হলঘরে ঢুকতেই কয়জন রৈ রৈ করে এগিয়ে এল। তবে একজন মেয়ে ছিল বলে খুব বাড়াবাড়ি করতে পারল না।

এসো পরিচয় করিয়ে দিই, রায়হান হাত ধরে টেনে মেয়েটার সামনে নিয়ে বলল, মাদার আর্থের আর্টিস্ট মিঃ জাহেদ। আর ইনি মিস সারা আহমদ! স্কালপচার কোর্স কমপ্লিট করে লণ্ডন থেকে ফিরেছেন!

আচ্ছা! বেশ বেশ- । কিন্তু আর কি বলবো খুঁজে পেলাম না।

সো হ্যাপী টু মীট ইউ মিঃ জাহেদ। সারা লিপস্টিক মাখা মোটা ঠোঁটজোড়া নড়িয়ে বললেন, আই লাইক ইওর পেইন্টিং মাচ। ইট্‌স রিয়্যালি নাইস।

থ্যাঙ্কইউ ফর ইওর কমপ্লিমেন্টস্‌। বাট আই থিঙ্ক ইট্‌স অনলি এ পীস অব প্রিলিমিনারী ওয়ার্ক্‌!

ও শিওর শিওর! এভরি জেনুইন আর্টিস্ট স্যুড হ্যাভ দিস নোশন এ্যাবউট হিজ ওয়ার্ক। আদারওয়াজ হি উইল ডিমিনিশ এভরিডে, আই হ্যাভ্‌ দি গুড্‌ অপরচুনিটি অব ওয়ার্কিং উইথ এ্যাপসটাইন। আই হ্যাভ সীন হাউ টেরিফিক হি ওজ! এ্যাণ্ড পিকাসো! ওহ্‌ হি ইজ এ ডেভিল! এ জায়ান্ট! এ গড! এ্যাণ্ড হোয়াট নট! আই ক্যুড নট বিয়ার হিম!

সারার চেহারা যাই হোক মেক আপটি অদ্ভুত। চুলগুলো যোগিনীর মতো ঝুঁটি করে বাঁধা, গলায় বড়ো কালো গোটার মালা। কাঁধ অবধি কাটা নীলরঙের ব্লাউজ। বেগুনী রঙের সিল্কের শাড়ির আঁচলটা বুকে পেঁচিয়ে রেখেছেন কিন্তু এসব কিছু নয় আমি নেহাৎ কথা বলবার জন্যই জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা যদি মনে কিছু না করেন আপনাদের বাড়ি কোথায়? দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ!

ইয়েস, ইউ আর রাইট। সারা মুখভঙ্গি করে বললেন, বাট আই হেট দ্যাট কান্ট্রি লাইফলেস এ ল্যাণ্ড অব মেয়ার মনটোনি। এ্যান আর্টিস্ট কান্ট লিভ দেয়ার, নেভার!

রায়হান মাঝখানে আমাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করল, টাকা পেয়েছিলে নাকি?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। অমনি লক্ষ্য করছিল সে কট্‌ করে বলল, তা হলে হয়ে যাক না এখনই?

মিস আহমদ আছেন সে জন্যেই হয় কি বলিস? রায়হান আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে

এরপর সারাও লক্ষ্য করেছে দেখে আমি বললাম, আপত্তি নেই তবে ও জিনিশ হবে না!

তোকে নিয়ে সত্যি মুশকিল! তাতে দোষটা কিসের?

ছবির টাকার সঙ্গে একটা পবিত্র স্মৃতি রয়েছে এদের কাছে বলতে যাওয়া অর্থহীন, তবু জানালাম, না ভাই তা হলে আমাকে মাফ করতে হবে।

ঠিক আছে অন্য জিনিশই খাব চল্‌। প্লিজ কাম অন উইথ আস মিস আহমদ! রায়হান হাত বাড়িয়ে আপ্যায়ন করল।

হোয়াই ? হোয়াটস্‌ দা ম্যাটার?

আমেদ হেসে বলল, নাথিং এ্যাট অল! লেট আস হ্যাভ দি প্রিভিলেজ অব অফারিং ইউ এ কাপ অব টি!

সারা হাততালি দিয়ে বললেন, ও নাইস আই ওজ রিয়্যালি ফিলিং লাইক দ্যাট!

মিরান্দা রেঁস্তোরার একটি কেবিনে গিয়ে বসি চারজন, মুজিব আসেনি সত্যি ওর দুর্ভাগ্য!

চা খেতে এসে বড়জোর টা পর্যন্ত গড়ানো উচিত ছিল কিন্তু ওদের কাণ্ডজ্ঞান অতুলনীয়। রায়হান বলল, কিছু খেয়েই ফেলা যাক্ জাহেদ। পাঁচ শ টাকা পেলি কুড়ি টাকাও বন্ধুদের জন্য খরচ করবিনে ?

অচেনা মেয়ের সামনে শুকনো হাসি হেসে নীরব হয়ে থাকা ছাড়া আমার উপায় নেই। এটা নিঃসন্দেহে সম্মতির লক্ষণ। রায়হান বন্ধবীকে শুধাল, ওয়েস্টার্ণ অর ওরিয়েন্টাল?

সার্টেনলি ওরিয়েন্টাল! ওয়েস্টার্ন পিপল আর গুড বাট নট দেয়ার ফুড। কথায় এমন সুন্দর একটা মিল দিতে পেরে সারা নিজেই উল্লাসধ্বনি করে ওঠেন।

খাবার এল জমজমাট ডিস্।

একটা প্লেট নিতে নিতে রায়হান বলল, যাই বলুন উই আর ভেরি মাচ ইনডেটেড টু দি মোঙ্গলস্। দে ওয়ার দা রিয়্যাল আর্কিটেক্টস অব দি কানন্ট্রি। দে নিউ হাউ টু এনজয় লাইফ। ওরিয়েন্টাল ডিস রিয়্যালি মিনস মোঙ্গল ডিস। অ্যাম আই রং?

সার্টেনলি নট্, সারা আঙুলে একটু চাটনি নিয়ে জিভে লাগান এরপর জিভটা ঠোঁটের সঙ্গে চাটতে চাটতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ডিলিশাস ডিলিশাস!

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সংকট অবস্থা। চারজনেই সিগারেট ধরাই। কিন্তু এরপর কি ? চা কফি কোকো অথবা অন্যকিছু? এক কাপ করে কফি খেতে আপত্তি নেই কিন্তু তবু কি যেন বাকী রয়ে গেল। রায়হান গলাখাকারী দেয়, উসখুস করেন সারা। আমেদ বানায় ধোয়ার রিং!

ওদের মানসিক অবস্থার মর্ম অনুধাবন করতে পেরে বললাম, আমি এখন উঠি রায়হান। আজ সন্ধ্যায় চলে যাচ্ছি, কিছু কেনাকাটা বাকী।

চলে যাচ্ছিস্ মানে! ওরা বিস্মিত হল যেন।

সত্যি চলে যাচ্ছি। আর তো কোনো কাজ নেই। ভালো লাগছে না মোটেই।

তুই একটা আস্ত— রায়হান গাধা কথাটা উচ্চারণ করল না।

যাই বলিস মেনে নিতে রাজি। সিট বুক হয়ে গেছে চলে যেতে হবেই। বেয়ারা পর্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তাকে বললাম, বিল লাও।

সারা সিগারেটটা এসট্রেতে পিষতে পিষতে বল্লেন দেন উই আর ডিপার্টিং টু-ডে?

ইয়েস ম্যাডাম আই কান্ট হেলপ ইট। বিল চুকিয়ে দেবার পর সকলের সঙ্গে করমর্দন করে সারাকে বললাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। বাংলাদেশে যাচ্ছেন তো আপনি? ঢাকায় নিশ্চয় দেখা হবে।

আই অলসো হোপ সো। ডোন্ট ফরগেট মি প্লিজ।

নিশ্চয়ই না। নিশ্চয়ই না। আমি একটু হেসে বললাম, একবার দেখলে আপনাকে ভোলা অসম্ভব!

ইউআর সো নাইস মিঃ জাহেদ। আই স্যুড হ্যাভ মোর টাইম উইথ ইউ! এনিওয়ে লেট আস হোপ ফরদি ফিউচার!

যাবার সময়টা ঘনিয়ে এল তাড়াতাড়ি। ভেবেছিলাম একবার দেখা করে যাব কিন্তু খালার ওখানে যাওয়ার মতো একটু ফাঁকও পাওয়া গেল না । সে জন্য অবশ্য আফসোস নেই। গেলে ভদ্রতাটুকু রক্ষা হত কিন্তু তার গুরুত্বইবা কত। নিজেদের নিয়মে ওরা চলেছেন যেখানে থেকে এসব চুটকি ব্যাপারের ধার ধারার প্রয়োজন অল্প। এয়ারপোর্টে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। যাক্ যাক্ সব পেছনে পড়ে থাক্। বন্ধুরা বলেছিল সি অফ করতে আসবে, না এলেই বরং ভালো।

প্যাসেঞ্জারস বাউণ্ড টু ঢাকা এটেনশন প্লিজ। মাইকে এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠি। তাহলে ওড়বার সময় হল?

সুপার কনস্টেলেশন বিমানের ইঞ্জিন চলছে, যেন ঝড়ের শব্দ। আমরা এখান যাচ্ছি সেই দিকে, দেশী বিদেশী বহুযাত্রী কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হতেই দৌড়ে এল চারজনঃ আমার তিন বন্ধু এবং সেই মেয়েটি। ওরা মৌতাত করে ফিরেছে চেহারায় তার স্পষ্ট ছাপ।

আমি দাঁড়ালাম মাত্র কিন্তু আলাপ করার সময় ছিল না। সারা একটুএগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, সাতদিন পর আমি যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই!

ওর বাংলাকে ঠেকা দেয়ার জন্যই আমি এবার পুরো ইংরেজীতে হাত নেড়ে বললাম, ও সাট্রেনলি! মোস্ট্ ওয়েলকাম এ্যাট মাই হোম! টাটা!

ভেতরে গিয়ে সব যাত্রী স্থির হয়ে বসলে পূর্ণবেগে প্রপেলার ঘুরতে লাগল এরপর প্লেন রানওয়েতে ছুটে গিয়ে আকাশে উড়লে এক বিমিশ্রিত আশ্চর্য অনুভূতিতে ভেতরটা অনুরণিত হতে থাকে আমার। তারায় ভরা ওপরে গভীর চিত্রিত আকাশ, নীচে মাটির পৃথিবী, মাঝে মাঝে ছোটো লালচে আলো। কিন্তু অনেক চেষ্টায় পেছনে ফিরে চাইলে নিমেষে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। আলো আলো, লাল নীল সবুজ আলো। প্রাচ্যের সিংহদরোজা করাচী নগরীর অফুরন্ত আলোর নৈবেদ্য প্রতিমুহূর্তে ঝিক্‌মিক্ করছে, ঠিকরাচ্ছে। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের যুগল সমারোহ।

কিন্তু এই আলোককেও আমি পেছনে ফেলে যাচ্ছি, হয়তো আসবো আর কোনদিন হয়তো আসব না। আসি বা না আসি দুইই এক সমান। কারণ আমার চোখে দূর সবুজের মায়া, মনজুড়ে শ্যামল মাটির স্বপ্ন।

বাইরে চেয়ে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, কিন্তু বিপদ প্লেন ঘন ঘন বাষ্প দিতে শুরু করল। এবং আধঘন্টার মধ্যে জেগে উঠল আবার এই আলোকমালা। আমরা সতর্ক হয়ে যাই।

বিমানটি আবার স্থির হয়ে দাঁড়াবার পর নেমে এসে জানতে পারলাম ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দেওয়ায় ফিরে এসেছে ।

এ আবার কি ঝামেলায় পড়া গেল। কোনো অশুভ লক্ষণ নয় তো?

ইঞ্জিনের পরীক্ষা ও মেরামত শেষ হলে বিমান আবার ছাড়ল সোয়া বারোটায়। এবার আকাশের আরো ওপর দিয়ে চলেছে। কাছে দূরে দেখা যায় ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো আবছা মেঘের সম্ভার। মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে এই মেঘকেই কত না কল্পনায় মণ্ডিত করেছি, অথচ এরা সত্যিই নিষ্প্রাণ বাষ্পের আয়োজন মাত্র!

তেমনি বাইরের রঙিন আলোর লেখন দেখে, সোনালী রুপালী চাকচিক্য দেখে, কোনদিন ভুলিনি এমন নয়, এমনকি মোহগ্রস্তও হয়েছি। কিন্তু আজ সে সব যেন মনে হচ্ছে অন্তঃসার শূন্য ফানুসের মতো ফাঁকা!

এই বিমানটি যদি হঠাৎ দুর্ঘটনায় পড়ে এবং সমস্ত সঙ্গীর মতো আমার দেহটিও টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে যায় তবে আমার কোনো দুঃখ থাকবে কি? থাকবে দুঃখ, থাকবে মৃত্যুর মুহূর্তে একান্ত সাধারণ একটি মেয়ের আটপৌরে হাতের কোমল স্পর্শ কপালে লাগল না বলে, তার চোখের দুইফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল না বলে আমার বুকের ওপর! এই দুঃখ সাধারণ, এই দুঃখ অসাধারণ।

যশগৌরবের দাম অনেক এবং কৃতীমাত্রেরই তা কাম্য। কিন্তু আমি উপলব্ধি করেছি এসবের চাইতেও যা বড় তা হচ্ছে একটি ছোট্ট মুখে এক টুকরো হাসি ফোটানো।

বন্ধুরা বলবে আমি ভুল করছি, একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ওপর নিজের হাতেই যবনিকা টেনে দিয়েছি।

আমি বলব যথার্থ। কারণ তাঁদের মতো মহান শিল্পী আমি হতে চাই না। সব মানবের শিরোমণি যাঁরা তাঁরা আমার প্রণম্য কিন্তু একজনের ছোট্ট হৃদয়ের সবটুকু অধিকার করে বেঁচে থাকাই আমার লক্ষ্য। কালের অতল গর্ভে তলিয়ে যাব, হারিয়ে যাব। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। কিন্তু তবু যাওয়ার বেলায় আমার ঠোঁটে থাকবে বিজয়ীর হাসি। এবং এটাই আমার বিদ্রোহ, এটাই আমার বিপ্লব। হাওয়ার ওপরে ভেসে বেড়ানো নয়, বসুন্ধরার দৃঢ় ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে কাজ করা । পুরাতন দুর্গকে ভেঙে নতুন প্রাসাদ গড়ে তোলার এই একমাত্র পথ। অন্যথায় আত্মধ্বংসই হবে সার।

ইঞ্জিনের একটানা ঘরঘর শব্দ। না, ইঞ্জিনের নয় আমার মস্তিষ্কের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অবিচ্ছিন্ন উৎকট সঙ্গীতের ঐকতান। ঘুম আসেনি কিন্তু চোখ মেলবার ক্ষমতাও ছিল না। চোখের পাতা বন্ধ করে মাথাটা এলিয়ে থাকি।

সে কতক্ষণ তাও বলতে পারব না। এরপর একসময় সত্যি চোখ মেললাম। দেখি অন্য দৃশ্য। সূর্য দেখা দিচ্ছে। বিমানটা একটি সুতীক্ষ্ণ তীরের মতো রাতের অন্ধকার থেকে দিনের আলোকে ছুটে গেল। তৎক্ষণাৎ হয়তো ঝকঝক করে উঠল ওর ধাতব শরীর।

ক্যাপ্টেনের শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ডিয়ার প্যাসেঞ্জারস্ গুডমর্নিং টু ইউ অল। বাই দি গ্রেস অব অল্‌মাইটি, উই হ্যাভ রিচড্ ঢাকা যাস্ট্ এ্যাট্ সিক্স ফিফ্‌টিন এ এম। থ্যাঙ্ক্ ইউ।

বিমানবন্দর থেকে বাসে আসবার সময় হাঁসের পালকের মতো মনটা হাল্কা হয়ে গেল। নগরীতে ফেলে এসেছি কুটিলতা, আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি দুশ্চিন্তা এবং এখন যা

আছে তা হল নদীতে ডুব দিয়ে গা জুড়িয়ে নেয়ার আকণ্ঠ আকাঙক্ষা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ভাবারও সময় নেই। এয়ার অফিসের কাছে এসে থামলে বাস থেকে নেমে রিকশায় উঠে পড়ি।

পরিচিত পথঘাট, পরিচিত মানুষের মুখের আদল, পরিচিত দোকান রেস্তোরাঁ কিন্তু তার চেয়েও পরিচিত আমার পাঁজরেরর ভেতরে যে এখন হৃৎপিণ্ডটা ঢিব্‌ঢিব্ করছে তা! এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছি কেন? এ চার দিনে অঘটন কিছু ঘটেনি তো? ছবি ভালো আছে? টুলটুল?

মাথায় টুপি দেওয়া কতকগুলি লোক রাস্তার পাশ দিয়ে মুর্দার খাট বয়ে নিয়ে গেলে ভেতরটা ছাৎ করে ওঠে। না, এদের মধ্যে-চেনা কেউ নেই।

গেটের কাছে গিয়ে রিকশা থামতেই জলদি করে নেমে পড়লাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ও কে? চোখ তুলে ভালো করে দেখবার আগেই ছুটে এল সরুপাড় সালোয়ার কামিজ পরা সেই মূর্তিটি, আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আমার খুব কাছে এখন, আমি কোনমতে আত্মসম্বরণ করে বলি, ছবি, আমার ছবি!

আমার বুকের ভেতরেই যেন বলছে, আমি জানতাম তুমি আসবে, তুমি আসবে আজ। সেজন্য প্লেনের শব্দ শুনেই বাইরে এসেছিলাম।

বুকের মাঝখান থেকে মুখটা দু'হাতে তুলে দেখি ওর চোখজোড়া অশ্রুজলে ভরা। কিন্তু সে অশ্রুজল নয়, আনন্দের মণিমুক্তা। এত সুন্দর হয়েছে ছবি!

ইস্ কাঁদছ দেখছি? শোনো লক্ষ্মী তোমাকে ছেড়ে আর কখ্খনো কোথায়ও যাব না। বাঁহাতে সুটকেসটা তোলবার পর ডানহাতে ওকে সাপটে ধরে এগুতে এগুতে বললাম, চলো অনেক সুখবর আছে, ভেতরে চলো।

তখন ভোরের সূর্যের রঙিন আভা আমাদের দু'জনের ওপর ঝলকে ঝলকে পড়ছে। এই সূর্য আদিম এবং অকৃত্রিম; কিন্তু আজকে যেন তারই পুনরাবৃত্তি নয়; বরং তার সন্ধানী সঙ্কেতে আমাকে নতুন সৃষ্টির মর্মমূলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সত্যি, অনুভূতির এক আশ্চর্য মুহূর্ত, একে ব্যর্থ হতে দেব না। ছবি আমার পাশেই ছিল, আর টুলটুলকে কোলের ওপর ধরে আমরা দু'জনে সেই আলোর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।